ইস্টবেঙ্গল সমাচার

জুলাই- আগস্ট ২০২৩ ■ দাম - ৫০ (পঞ্চাশ টাকা)

১০৪ বর্ষে পদার্পণ

ইস্টবেঙ্গল কোচ কুয়াদ্রাতের সঙ্গে সহকারীরা

শুভেচ্ছা নিয়ে অনুশীলনে কোচ কুয়াদ্রাত

সূচি

১০৪-এ পদার্পণ

জুলাই-আগস্ট ২০২৩

সুদীপ্ত ভট্টাচার্য : পায়ে পায়ে ১০৪ বছরে ইস্টবেঙ্গল ২-৩

জয় চৌধুরী : ইস্টবেঙ্গলের সফল সচিবরা ৪-৫

জয়ন্ত চক্রবর্তী ও কুশল চক্রবর্তী : মরণোত্তর সম্মান ওপার বাংলার মুন্নাকে ৬

সমাচার প্রতিবেদন : জীবন কৃতি সম্মান পেয়ে অভিভূত তরুণ ৭

ব্রান্ড ইস্টবেঙ্গল ৮-৯

সমাচার প্রতিবেদন : জীবন কৃতি সম্মান হৃদমাঝারে রেখে দেবেন অরূপ ১০

সমাচার প্রতিবেদন : অপ্রতিরোধ্য গুরপ্রীতে নবমবার সাফ কাপ জয় ভারতের ১১

সমাচার প্রতিবেদন : প্রয়াত চন্দন বন্দ্যোপাধ্যায় ইস্টবেঙ্গলে চিরদিনই সুরভিত ১২

অরূপ পাল : মালি থেকে ফুটবলারদের বাবা হয়ে উঠেছিলেন শঙ্কর পিল্লাই ১৩-১৪

পারিজাত মৈত্র : মহিলা ফুটবলের উত্থান একটি বিস্ময়কর উন্নয়ন : শুভাশিস চক্রবর্তী ১৪-১৫

ভারত গৌরব

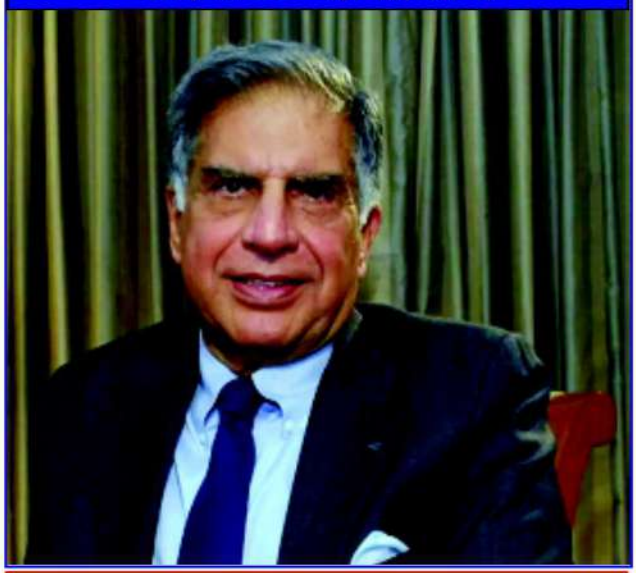

১লা আগস্ট, ২০২৩। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের প্রতিষ্ঠা দিবসে প্রখ্যাত ক্রীড়া মনস্ক শিল্পপতি রতন 'টাটাকে ভারত গৌরব সম্মানে সম্মানিত করবেন লাল-হলুদ কর্তারা।

সম্পাদকীয়

১০৪ বছরে পদার্পণ। ১৯২০ সালের ১ আগস্ট ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের প্রতিষ্ঠা। দীর্ঘ ১০৩ বছর বহু লড়াই করতে হয়েছে লেসলি ক্লডিয়াস সরণির ক্লাব ইস্টবেঙ্গলকে। ক্লাব প্রতিষ্ঠাতা সুরেশ চৌধুরীর লড়াই ছিল মনে রাখার মতো। যে লড়াই চলছে আজও। লড়াই করার মাঝেও কলকাতা ময়দানে একেবারে শিরদাঁড়া সোজা করে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব দাঁড়িয়ে রয়েছে লেসলি ক্লডিয়াস সরণিতে। বহু ঝড়-ঝাপটা সামলে সঠিক লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে লাল-হলুদ শিবির। লড়াই করে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব প্রথম কলকাতা লিগ চ্যাম্পিয়ন হয় ১৯৪২ সালে। ১৯৩৪ থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত টানা পাঁচ বছর কলকাতা লিগ জয়ের রেকর্ড ছিল মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের দখলে। মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের টানা পাঁচবার লিগ চ্যাম্পিয়ন রেকর্ড ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ভেঙ্গে দেয় ১৯৭০ থেকে ১৯৭৫ সালে কলকাতা লিগ চ্যাম্পিয়ন হয়ে। এরপর নিজেদের রেকর্ড নিজেরাই ভেঙ্গে দেয় লেসলি ক্লডিয়াস সরণির ক্লাবটি। ২০১০ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত টানা আটবার ঘরোয়া লিগ চ্যাম্পিয়ন হয়ে নয়া নজির গড়ে ইস্টবেঙ্গল। সবচেয়ে বেশিবার কলকাতা লিগে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার কৃতিত্ব রয়েছে লাল-হলুদ শিবিরের। শুধু কলকাতা লিগ নয়, আইএফএ শিল্ড ফাইনালে সর্বাধিক গোলের ব্যবধানে জয় পাওয়ার রেকর্ড রয়েছে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের দখলে। ১৯৭৫ সালে টানা ছয়বার কলকাতা লিগ জয়ের রেকর্ড গড়ার পাশাপাশি সেবার শিল্ড ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল পড়শি পাড়ার মাঠে পড়শি পাড়ার ক্লাবকে ফাইনালে হারিয়েছিল পরিস্কার ৫-০ গোলে। যে রেকর্ড আজও অক্ষত। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর প্রথম বিদেশি দলকে হারিয়ে আইএফএ শিল্ড জয়ের রেকর্ড রয়েছে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের। ১৯৭০ সালে ইডেনের মাঠে অনুষ্ঠিত শিল্ড ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল শেষ মুহূর্তে পরিমল দের করা গোলে হারিয়েছিল ইরানের পাস ক্লাবকে। শুধু সত্তর সালে নয়, এর পরেও বেশ কয়েকবার বিদেশি দলকে হারিয়ে শিল্ড জয়ের রেকর্ড রয়েছে শতাব্দী প্রাচীন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের। লিগ,শিল্ডের পাশাপাশি ডুরান্ড, রোভার্স, ডিসিএম, বরদলুই, নাগজি, স্ট্যাফোর্ড, দার্জিলিং গোল্ড কাপ, সিকিম গর্ভর্নস গোল্ড কাপ, কলিঙ্গ কাপ এবং এয়ার লাইন্স গোল্ড কাপে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার কৃতিত্ব রয়েছে ইস্টবেঙ্গলের। শুধু দেশের মাটিতে নয়, বিদেশের মাটিতেও চ্যাম্পিয়ন হওয়ার নজির রয়েছে ইস্টবেঙ্গলের। তবে বিদেশের মাটিতে ২০০৩ সালে শক্তিশালী বেকতেরা সাসানাকে ফাইনালে ৩-১ গোলে হারিয়ে আসিয়ান কাপ জয়টা লাল-হলুদ সমর্থকদের হৃদ মাঝারে জায়গা করে নিয়েছে। এছাড়া নেপাল, শ্রীলঙ্কা থেকেও ট্রফি জয়ের নজির রয়েছে লেসলি ক্লডিয়াস সরণির ক্লাবটির। মাঝে বেশ কয়েক বছর হয়তো সেরকম সাফল্য নেই ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের। ১০৪ তম প্রতিষ্ঠা দিবসে সবার দাবি হোক নতুন মরশুমে ইস্টবেঙ্গল আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসল লবে। আমরা আশাবাদী লাল-হলুদ শিবিরের মশাল ফের স্ব-মহিমায় জ্বলে উঠবে।

ইস্টবেঙ্গল সমাচার পত্রিকার দাম বৃদ্ধি

বর্তমানে আর্ট পেপারের দাম অত্যাধিক বৃদ্ধি হওয়ার জন্য ইস্টবেঙ্গল সমাচার পত্রিকার দাম বৃদ্ধি করতে বাধ্য হলাম। তাই ১০ টাকার পরিবর্তে জুন মাস থেকে ইস্টবেঙ্গল সমাচার পত্রিকার দাম ৫০ টাকা করা হয়েছে।

ইস্টবেঙ্গল লাইব্রেরি ও আর্কাইভ খোলা থাকবে প্রতিদিন দুপুর দুটো থেকে সন্ধ্যা ছটা পর্যন্ত, রবিবার বন্ধ। মেম্বারর্স লাউন্স খোলার সময় দুপুর ১২টা। প্রতিদিন খোলা থাকবে সবার জন্য।

পায়ে পায়ে ১০৪ বছরে ইস্টবেঙ্গল

সুদীপ্ত ভট্টাচার্য, ক্রীড়া সাংবাদিক

লড়াই, লড়াই আর লড়াই। জন্মলগ্ন থেকে যা ছিল ইস্টবেঙ্গল নামক ক্লাবটির নিত্যসঙ্গী। তবুও কঠিন লড়াইয়ের সম্মুখীন হয়েও কখনও কোনো অবস্থাতেই পিছিয়ে আসেনি লাল-হলুদের সৈনিকরা। কোনি বইয়ের ক্ষীর্দা হয়েই সেই কঠিন সময়ে ইস্টবেঙ্গল নামক ক্লাবটির ব্যাটন হাতে এক এক সময় এক একজন নেতৃত্ব তুলে নিয়ে ক্লাবকে পৌঁছে দিয়েছেন ভারতীয় ক্লাব ফুটবলের উচ্চ শিখরে। যেখানে আজীবন উড়তে থাকবে লাল-হলুদ পতাকা।

কঠিন এই লড়াই যেমন ছিল, পাশাপাশি এই ক্লাবের সাফল্যের খতিয়ানও ছিল ঈর্ষান্বিত। কি দেশের মাটিতে, কি বিদেশের মাটিতে। মূলত ওপার বাংলার ভিটে মাটি ছেড়ে আসা উদ্বাস্তুদের বঞ্চনার প্রতিবাদে জন্ম নেওয়া ইস্টবেঙ্গল নামক ক্লাবটি চলতি বছরের ১ আগস্ট পদার্পণ করবে ১০৪ বছরে।

ক্লাবের জন্মলগ্ন থেকে লড়াই যেমন ছিল, তেমনই ছিল সাফল্যও। ভারতীয় ক্লাব ফুটবলে মশাল বাহিনীর দাপটের ইতিহাস অক্ষুণ্ণ থেকে যাবে চিরকাল। শুধু দেশের মাটিতে নয়, বিদেশের মাটিতে ভূমেও নজরকাড়া সাফল্য রয়েছে ইস্টবেঙ্গল নামক শতাব্দী প্রাচীন এই ক্লাবটির।

১৯৮৫ সাল প্রতিবেশী দেশ শ্রীলঙ্কার রাজধানী কলম্বোয় আয়োজিত এশিয়ান ক্লাব কাপের আসরে বিজয়ী হয় আজকের শতাব্দী প্রাচীন ইস্টবেঙ্গল ক্লাব। এই সাফল্য কি শুধু বাঙালদের মনেই অহঙ্কার বোধের জন্ম দিয়েছিল তা নয়, গৌরবান্বিত করেছিল গোটা দেশবাসীকে। প্রমাণ হয়েছিল বাঙালিরাও কিন্তু পারে।

এখানেই তো থেমে থাকলে চলবে না। আরও বড় সাফল্য আমাদের জয় করতে হবে। কেননা লড়াই বঞ্চনা, অবজ্ঞার সময়োচিত জবাব দেওয়ার জন্যই তো এই ক্লাবের প্রতিষ্ঠা। সুতরাং সাফল্য যখন আসতে শুরু করেছে এবার লক্ষ্য আরও আরও বড়।

এই মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েই এরপর লাল-হলুদের ১১ জন হার না মানা সৈনিকের ঈর্ষান্বিত সাফল্য এল আর এক প্রতিবেশী দেশ নেপালের মাটি থেকে। লাল-হলুদ সৈনিকরা জয় করে ফিরলেন ওয়াই ওয়াই কাপ। এ যেন সাফল্যের এভারেস্টের চূড়া জয় করার দ্বিতীয় ধাপ অতিক্রম করা।

তৃতীয় ধাপ জয়ের সাফল্যটা যেন আগের দুই সাফল্যকে কিছুটা হলেও ম্লান করে দিয়েছিল। বিদেশের মাটিতে আগের দু'বার সাফল্য পাওয়ার পর বেশ কিছুটা সময় আর বিদেশের মাঠে কোনো টুর্নামেন্ট খেলেনি ইস্টবেঙ্গল। কেননা সেই সময় তারা ব্যস্ত ছিল ভারতীয় ফুটবলে নিজেদের সাফল্যের সিঁড়ি বেয়ে আরও ওপরে উঠে শীর্ষস্থান ধরে রেখে নতুন নতুন নজির গড়ার দিকে। যে নজির স্পর্শ করা তো দূর অস্ত, ছুঁয়ে দেখার সাহস দেখাতে হিম্মত হবে না প্রতিপক্ষ কারোর। সেই অভীষ্ট লক্ষ্যেও সফল লেসলি ক্লডিয়াস স্মরণীয় বহু ইতিহাসের সাক্ষী আজকের ইস্টবেঙ্গল ক্লাব।

২০০৩ সাল। ইস্টবেঙ্গল ক্লাব এবার পাড়ি দিল ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তায়। সেখানে আয়োজিত আসিয়ান কাপে অংশ নেওয়ার জন্য। সেই জাকার্তা। যে জাকার্তার মাটিতে ১৯৬২ সালে ভারতীয় ফুটবলারদের নতুন সূর্য উদয় হয়েছিল। সেই মাটিতেই এবার নতুন এক ইতিহাস রচনা করল ইস্টবেঙ্গল। এই টুর্নামেন্টে ইস্টবেঙ্গল ছাড়াও ছিল ধারে ও ভারে অনেকটাই এগিয়ে থাকা বেক তারা সাসানা, ছিল আরও বেশ কয়েকটি দলও।

টুর্নামেন্ট শুরু হওয়ার পর গ্রুপ লিগের ম্যাচে চাইম্যান সমৃদ্ধ বেক তারা সাসানার কাছে ১-০ গোলে পরাজিত হতে হয়েছিল লাল-হলুদ বাহিনীকে। এই ম্যাচে পরাজয়ের গ্লানিই তৎকালীন লাল-হলুদ ফুটবলারদের হৃদয়ে জ্বালিয়েছিল প্রতিশোধের অগ্নি স্ফুলিঙ্গ। যে অগ্নিশিখায় টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচে মশাল বাহিনীর কাছে পুড়ে ছারখার হয়ে গিয়েছিল বেক তারা সাসানা। ইস্টবেঙ্গল ম্যাচটা জিতেছিল ৩-১ গোলের ব্যবধানে। কি অসাধারণ ফুটবল সেদিন বাইচুং-অ্যালভিটো-দীপক-মহেশ-সন্দীপ -ষষ্ঠী-চন্দন, দেবজিৎ ঘোষরা খেলেছিলেন তা আজ এত বছর পরেও শোনা যায় গোটা লেসলি ক্লডিয়াস স্মরণী জুড়ে। স্বাভাবিকভাবে এই সাফল্যের ইতিহাস তো কখনও শেষ হওয়ার নয়। যুগ যুগ ধরে তা আজকের মতোই বহমান থাকবে ভারতীয় ক্লাব ফুটবলের ইতিহাসের প্রথম পাতায়। যা পড়ে আজকের তরুণ প্রজন্ম উপলব্ধি করবে এই স্বর্ণজ্জ্বোল মুহূর্তের সাক্ষী হতে চান তাঁরাও।

এই আসিয়ান কাপ জয় যেমন লাল-হলুদের আম জনতা কোনদিন ভুলবেন না, ঠিক তেমনই দেশের মাঠে ১৯৭০ সালের আইএফএ শিল্ডের ফাইনাল ম্যাচটার কথা। তুলবেন না লাল-হলুদ সমর্থকরা। সেবার ইডেনের সবুজ ঘাসে ঐতিহাসিক জয় পেয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। প্রতিপক্ষ ছিল ইরানের পাস ক্লাব। প্রয়াত কিংবদন্তি ফুটবলার পরিমল দে-র করা একমাত্র গোলে সেদিন যেন লাল-হলুদ বর্ণজ্জ্বোল ছটায় উদ্ভাসিত হয়েছিল গোটা ইডেন জুড়ে। ক্রিকেটের নন্দনকাননের সেই ইতিহাস যুগ যুগ ধরে অমলিন থেকে যাবে আপামর লাল-হলুদের জনতার মনে।

এ ছাড়াও আরও ঘরোয়া খেতাব জয় করেছে ইস্টবেঙ্গল। সেই ইতিহাসও যথেষ্ট ঈর্ষাণ্বিয়। ফেডারেশন কাপ থেকে শুরু করে ডিসিএম, নাগজি, দার্জিলিং গোল্ড কাপের মতো খেতাবও বহুবার জয় করেছিল ইস্টবেঙ্গল। যাও ইতিহাসের পাতায় জ্বল জ্বল করছে, করবে চিরকাল। সঙ্গে তো আছে কলকাতা লিগ জয়ের খেতাবও।

তবে খেতাব জয় করেই শুধু ক্ষান্ত হয়নি ইস্টবেঙ্গল ক্লাব। বহু স্বনামধন্য ফুটবলার ভারতীয় ফুটবলে উপহার দিয়ে চলছে শতায়ু পার করা আজকের এই প্রতিষ্ঠানটি। যা আজও একই ধারায় বহমান। খেলোয়াড়দের সেই তালিকা তৈরি করতে বসলে বইয়ের পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা শেষ হয়ে যাবে। তবুও নাম শেষ হবে না। তাই তো ইস্টবেঙ্গল ক্লাব প্রাক্তন থেকে বর্তমান সকল খেলোয়াড়দের কাছে মন্দিরের মতো। লাল-হলুদ জার্সি তাঁদের কাছে মায়ের মতো। তাই তো খেলোয়াড়রা আরও স্বপ্ন দেখেন জীবনে অন্তত একটিবার লাল-হলুদ জার্সি গায়ে চাপিয়ে মাঠ কাঁপাতে।

আজকের ইস্টবেঙ্গল ক্লাব চলতি বছরে পদার্পণ করলো ১০৪ বছরে। তবে দীর্ঘ এই পথ অতিক্রম করতে কম ঝড়-ঝাপটার সম্মুখীন হতে হয়নি শতায়ু প্রাচীন এই ক্লাবটিকে। কেবলমাত্র বঞ্চনা, অবহেলা, অবজ্ঞার ফলে যে ক্লাবের জন্ম হয়েছিল তাকে তো লড়াই করেই এগোতে হবে, প্রতিনিয়ত এটাই তো কালের নিয়ম। যা ইস্টবেঙ্গলের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নয়।

১৯২০ সালের ১ আগস্ট। উত্তর কলকাতার কুমারটুলি পার্কে সুরেশ চৌধুরী, শৈলেন বসু, নসা সেন মিলে তৈরি করেছিলেন আজকের ইস্টবেঙ্গল ক্লাব। ভারতবর্ষের আকশে বাতাসে তখনও পরাধীনতার গ্লানি। ব্রিটিশ শাসনের হাত থেকে স্বাধীনতার মুক্তির স্বাদ পেতে তখন উদগ্রীব অবিভক্ত ভারতবর্ষ। সেই সময়ই কোচবিহার ট্রফিতে শৈলেস বসুকে অন্যায়ভাবে বাদ দেন জোড়াবাগান ক্লাবের কর্তারা, যা মেনে নিতে পারেননি সুরেশ চৌধুরীরা। দেশ অবিভক্ত থাকলেও প্রাদেশিকতার মতো গ্রাসের থাবায় আক্রান্ত হয়ে তখনও যেন এপার বাংলার আদি অধিবাসীরা তাচ্ছিল্যের মতো ব্যবহার করতেন ওপার বাংলার লোকেদের প্রতি।

এই প্রাদেশিকতার সংকীর্ণতা দিনের পর দিন সহ্য করতে হয়েছে ওপার বাংলার ভিটে-মাটি ছেড়ে আসা উদ্বাস্তুদের। ভিটে মাটি ছেড়ে আসা বাঙালদের প্রতি এই বিদ্বেষ সবকিছুকে হারিয়ে খেলার মাঠেও প্রতিফলিত হয়েছিল। আর সেই সংকীর্ণতা দূর করে ইতিহাস তৈরি করেই প্রতিষ্ঠা হয়েছিল আজকের ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের। তাই বিগত বছরের মতো চলতি বছরেও ক্লাবের প্রতিষ্ঠা দিবস স্মরণীয় করে তুলতে গ্রহণ করা হয়েছে নানা পদক্ষেপ। ১ আগস্ট সকালে ক্লাব তাঁবুতে উত্তোলন করা হবে ক্লাবের পতাকা। কাটা হবে কেক। আর বিকেলে ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান। সেই মঞ্চ থেকেই এবার ক্লাব কর্তারা জীবন কৃতি সম্মানে ভূষিত করবেন ক্লাবের দুই প্রাক্তন খেলোয়াড় তরুণ বসু ও প্রাক্তন ক্রিকেটার অরূপ ভট্টাচার্যকে। ভারত গৌরব সম্মান দেওয়া হবে শিল্পপতি রতন টাটাকে।

ইস্টবেঙ্গলের সফল সচিবরা

জয় চৌধুরী, বিশিষ্ট সাংবাদিক

তখন দল বদল হতো ১ থেকে ১৫ মার্চ। তাই ইস্টবেঙ্গলের নির্বাচন ছিল এপ্রিলে। ১৯৭০ থেকে ১৯৭৫ আক্ষরিকভাবে ইস্টবেঙ্গলের সোনার বছর। এই স্বর্ণযুগের সূচনা জে সি গুহ'র হাত ধরে। কিন্তু নির্বাচনে ডাক্তার নৃপেন দাস গোষ্ঠীর কাছে তিনি পরাজিত হন অভাবিতভাবে। ইস্টবেঙ্গলের এই পালা বদলে জীবন চক্রবর্তী এবং পল্টু দাসের একটা বড় ভূমিকা ছিল। বলা যায় এই নির্বাচনে ময়দানের বিখ্যাত এই জুটি ইস্টবেঙ্গলের রাজনীতিতে নিজের পায়ের তলায় মাটি পেয়েছিলেন।

জ্যোতিষ গুহ

ডাঃ নৃপেন দাস

পল্টু দাস

তবে সচিব হিসেবে জেসি গুহ যেখানে শেষ করেছিলেন সেখান থেকেই ক্লাবের হাল ধরেন ডাক্তার নৃপেন দাস। তার কার্যকালের প্রথম তিন বছর তাকে স্বর্বতভাবে সাহায্য করেছিলেন অজয় শ্রীমানী। ১৯৭২ সালের ফুটবল সচিব ছিলেন অজয় বাবু। ১৯৭৭ পর্যন্ত ছিলেন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের ফুটবল সচিব। তার আমলে ইস্টবেঙ্গল ভারতের সবকটি ট্রফি পেয়েছে। ১৯৭৫ সালের শিল্ড ফাইনালে মোহনবাগানকে ৫-০ গোলে হারিয়ে দিয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। তখন তো সচিব ডাক্তার নৃপেন দাস। ১৯৭২ সালে পেয়েছিল ত্রিমুকুট। সেটাই ভারতীয় ফুটবল কোনো ক্লাবের প্রথম ত্রি মুকুট জয়। অত্যন্ত কড়া ধাঁচের প্রশাসক ছিলেন তিনি। ১৯৭৯ সালের নির্বাচনে হেরে যান নৃপেন দাস। তাঁর জায়গায় সচিব হন নিশীথ ঘোষ। ওই সময় ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন অরুণ ভট্টাচার্য, মধুবাবু বলে যিনি পরিচিত ছিলেন। নিশীথ ঘোষের জমানায় তার ভাই সুবীর ঘোষ ফুটবল টিমের নিয়ন্ত্রণ অনেকটাই নিজের হাতে নিয়ে নেন মধুবাবুকে সঙ্গে করে। ক্লাবে কিছুটা কোণঠাসা হয়ে পড়েন জীবন-পল্টু দাস জুটি। কিন্তু নাছোড় মনোভাবে তারা আবার ফিরে আসেন ১৯৮৫ সালে। সচিব হয়েছিলেন ডাক্তার ভব রঞ্জন সেনগুপ্ত।

নৃপেন দাস জমানা শেষ হবার পর ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের নিয়ন্ত্রণ আস্তে আস্তে নিয়ে নেন পল্টু দাস, তাঁর সক্রিয় গুণে। কারণ দলবদলের সময় যাবতীয় টাকার সংস্থান তিনি করতেন। সকাল সাতটায় চলে গেছেন শুভানুধ্যায়ীদের বাড়ি। এমনও হয়েছে কোনো ব্যক্তির কাছে সকাল সাতটায় গিয়ে ধরতে পারেননি আবার রাত্রি দশটায় গিয়েছেন। ইস্টবেঙ্গল ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সুরেশ চৌধুরী। কিন্তু পরবর্তীকালে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ময়দানে নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছিল ভাগ্যকুলের জমিদার বনোয়ারি লাল রায়ের জন্য। ইনি পঙ্কজ রায়, প্রণব রায় পরিবারের মানুষ। ইস্টবেঙ্গলের জন্ম লগ্নে জোড়াবাগান কিংবা কুমারটুলি দারুণভাবেই জড়িয়ে আছে। তাই বর্তমান কর্মকর্তারা কুমারটুলির পাড়া থেকে ২০১৯ সালে শতবার্ষিকী শোভাযাত্রা শুরু করেছিলেন। কিন্তু শতাব্দী পেরিয়ে যাওয়া এই ক্লাবটির তিন সেরা সচিব বা কর্মকর্তা বেছে নিতে হলে সুরেশ চৌধুরী, বনমালী রায়ের অবদানের কথা স্বীকার করেও বলতে হবে তিনজনের নাম। এরা হলেন জে সি গুহ, ডাক্তার নৃপেন দাস এবং অবশ্যই পল্টু দাস। এদের ভাবধারাকে সম্মান জানিয়েই বর্তমান কর্মকর্তারা ইস্টবেঙ্গল ক্লাবকে টেনে নিয়ে চলেছেন। জে সি গুহের হাত ধরেই দক্ষিণ কলকাতা সঙ্গে লাল-হলুদের মেলবন্ধন। চারের দশকের শেষ দিকে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে পা রাখেন জে সি গুহ। আস্তে আস্তে ফুটবল টিমের সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯৫২ থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন ক্লাবের সহ-সচিব। জে সি গুহ ক্লাবে পা রাখার পরেই লাল-হলুদের পঞ্চপাণ্ডবের যুগ শুরু। কাছাকাছি বাড়ি হওয়ায় তার সঙ্গে বসুশ্রী সিনেমা হলে মালিক মন্টু বসু সখ্যতা ছিল। আমেত খাঁ থাকতেন বসুশ্রী সিনেমা হলের ওপরে। তখন ভোরবেলায় গঙ্গার জলে রাস্তা ধোওয়ার চল ছিল। কলকাতা পুরসভার সরবরাহ করার সেই জল বসুশ্রী সিনেমা হলের সামনের ফুটপাতে ঢেলে স্লিপারিং সারফেসে স্কিল প্র্যাকটিস করতেন আমেদ খান। আমেদ খানের বেঙ্গালুরুর কলাকার পার্কের বাড়িতে ২০০৮ এবং ২০১১ সালে যাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। শ্যাম সুন্দর ঘোষ, মানস চক্রবর্তী, অর্ঘ্য বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া এই শতাব্দীতে কলকাতার কোনো ক্রীড়া সাংবাদিক আমেদ খানের বাড়িতে যাননি। আমেদ খানের স্ত্রীর পোশাকি নাম আয়েশা বিবি। কিন্তু তিনি বাঙালি আসল নাম অঞ্জলি। যাদবপুরের মেয়ে। ওদের কাছে দু'বারই শুনেছিলাম গুহ সাহেবের নাম। আমেদ খান বলতেন, আমাদের যত্ন করে রাখতেন জেসি গুহ। আর তার সঙ্গে ছিলেন মন্টু বসু। ভারতীয় ফুটবলে ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৫৩ ইস্টবেঙ্গল "রাজ" করেছে। নেপথ্যে পঞ্চপাণ্ডব এবং সেই সঙ্গে জেসি গুহর অক্লান্ত পরিশ্রম। এরপর মোহনবাগানে চুনী গোস্বামী-জার্নাল সিং-কেম্পিয়াদের যুগ শুরু হয়ে যায়। ছয় দশকের প্রথম পাঁচটি বছর একান্তভাবে মোহনবাগানের। ঠিক এই কারণেই মেরিনাসদের প্রভাব খর্ব করতে ১৯৬৫ সালে জেসি গুহকে সচিব করা হয়। তিনি ১৯৭০ সাল পর্যন্ত সচিব পদে ছিলেন। সচিব হবার পরবর্তী বছর অর্থাৎ ১৯৬৬ সালে তিনি মোহনবাগানের আধিপত্য খর্ব করে দিয়েছিলেন। ১৯৬৬ সালে তিনি দেরাদুনের গোর্খা ব্রিগেড থেকে নিয়ে আসেন শ্যাম থাপাকে। হায়দরাবাদ থেকে নিয়ে আসেন হাবিব এবং নঈমকে। শুধু কলকাতা লিগেই চ্যাম্পিয়ন হয়নি, শিল্ড জয় করেছিল ইস্টবেঙ্গল। সদ্যপ্রয়াত চন্দন ব্যানার্জিকে সেবার ক্যাপ্টেন করেছিলেন জেসি গুহ। মোহনবাগানে যখন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কোচ হিসেবে বলাই দাস চ্যাটার্জি ফুল ফোটাচ্ছেন তখন ইস্টবেঙ্গল খেলোয়াড়দের অনুশীলনে 'পরামর্শ দিতে নিজেই মাঠে নেমে যেতেন জেসি গুহ। কার্যত কোচ, ম্যানেজার এবং সচিব এই তিন ধরনের ভূমিকায় তখন ইস্টবেঙ্গল অনুরাগীরা তাকে দেখেছেন এবং প্রতিটি ভূমিকাতেই তিনি নিজেকে উজাড় করে দিয়েছেন। ১৯৭০ সাল ছিল ইস্টবেঙ্গলের সুবর্ণজয়ন্তী। সুবর্ণ জয়ন্তীবর্ষের টিমটি তিনি তৈরি করেছিলেন। সেবার শিল্ড ফাইনালে ইরানের পাস ক্লাবকে হারিয়ে চমক দেখিয়ে ছিল ইস্টবেঙ্গল। এরপর নির্বাচনে ক্রিকেট সচিব সমীর দাশগপ্ত একটা বড় ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করেছিলেন। ফুটবল সচিব প্রদীপ সেনগুপ্তকে ফুটবল সচিব পদে প্রার্থী করা হয় পল্টু দাসের প্যানেল থেকে। কিন্তু কৌশলীর পল্টু দাস বাজিমাত করেন। তাঁর হাত ধরেই তখন উঠে এসেছিলেন সদানন্দ দাস, শান্তি চৌধুরীর মতো কর্মকর্তারা। ক্লাবের নিয়ন্ত্রণ এইভাবে নিজের হাতে রাখলেও পল্টু দাস কিন্তু সচিব হতে রাজি ছিলেন না।

সচিব না হওয়াটাই কিন্তু তার মাস্টার্স স্ট্রোক। সেদিকে তাঁর নজর ছিল না কোনদিনই। ১৯৯৫ সালে তিনি বাবু ভট্টাচার্যকে তুলে এনেছিলেন, যিনি পরবর্তী প্রায় দেড় দশক ক্লাবকে দারুণ সার্ভিস দিয়েছেন একজন ফুটবল সচিব হিসেবে। এই দূরদৃষ্টি পল্টু দাসকে অন্য মাত্রায় নিয়ে গিয়েছিল। ২০০১ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি। সেবার অন্যবারের তুলনায় অনেক সহজ নির্বাচন ছিল পল্টু দাসের কাছে। অনুগামীদের আবদারে তিনি সচিব হতে রাজি হন। কিন্তু ৩১ দিনের মাথায় তিনি মারা যান। ভাগ্য ভালো সেবার সচিব হতে রাজি হয়েছিলেন। তাই ইতিহাসের পাতায় সচিব হিসেবে পল্টু দাসের নামটি লেখা আছে। কর্মকর্তা হিসেবে শেষ একদশকে তাঁর সেরা কাজ ছিল ইবি গ্রুপকে ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে যুক্ত করা। মোহনবাগান নয়, বিজয় মালিয়া প্রথমে ইস্টবেঙ্গলকে কথা দিয়েছিলেন স্পনসর করার জন্য। পরবর্তীকালে টুটু বসু বিজয় মালিয়াকে ধরে ম্যাকডুয়েলকে যুক্ত করেছিলেন মোহনবাগানের সঙ্গে। শুধু স্পনসর আনা নয়, জরাজীর্ণ ক্লাব তাঁবু সংস্কার করেছিলেন পল্টু দাস সন্তোষ মোহন দেবের সাহায্যে। প্রয়োজনে অর্থ সংগ্রহের জন্য দু'বার শিলচরে দলকে পাঠিয়েছিলেন প্রদর্শনী ম্যাচ খেলার জন্য। ইস্টবেঙ্গলের পরিকাঠামো আজ সমর্থকদের গর্ব, রাজপ্রাসাদের মতোই আজ ইস্টবেঙ্গল তাঁবু। এই কাজটি কিন্তু শুরু করে গেছেন পল্টু দাস। তার দেখানো পথেই একটি একটি করে গীত তৈরি হয়ে আজকে এই রাজপ্রাসাদের চেহারা নিয়েছে। এক সময় প্রয়াত সচিব পল্টু দাসের হাত ধরেই উঠে এসেছেন দেবব্রত সরকার, রাজা গুহ, বাবলু গাঙ্গুলী, বাবু ভট্টাচার্য এবং সর্বোপরি বর্তমান সচিব কল্যাণ মজুমদার। পল্টু দাস প্রয়াত হওয়ার পর সচিব পদে নির্বাচিত হন কল্যাণ মজুমদার। টানা ২২ বছর ধরে তিনি সচিব পদে রয়েছেন। ক্লাবকে এগিয়ে নিয়ে যেতে কল্যাণ মজুমদারের অবদানও কম নয়। তিনি ক্লাবের প্রতীক এবং লোগোকে রেজিস্টার্ড করেছিলেন। ক্লাবকে সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট (১৯৬১) নথিভুক্ত করনের কাজটিও করেছেন কল্যাণবাবু। তার অবদানও অনস্বীকার্য। এভাবেই যুগের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এগিয়ে চলেছে লাল-হলুদ। পয়লা আগস্ট-এর আগেই আরও একটি ঘর হচ্ছে তাঁবুতে। এই ঘরটি নির্দিষ্ট হচ্ছে লোকাল অর্গানাইজিং কমিটির জন্য। এই যে অধুনা ক্যাফেটেরিয়া দেখা যাচ্ছে সেটি স্ট্রাকচার হয়েছিল পল্টু দাসের আমলে। সন্তোষ মোহন দেবের আমলে যখন মূল তাঁবু সংস্কার শুরু হয় তখন অস্থায়ী তাঁবুর জন্য এই ঘরটি করা হয়। পরবর্তীকালে কিছু দিন এই ঘরটি ছিল জিমনাসিয়াম। এখন ক্যাফেটোরিয়া। তার পাশে টিকিট বণ্টনের জন্য করা হচ্ছে আরও একটি ঘর। কয়েক মাসের মধ্যেই ভিআইপি লাউঞ্জের কাজ শেষ হবে। সব মিলিয়ে পরিকাঠামো নিঃসন্দেহে এগিয়ে ইস্টবেঙ্গল। যদিও রেড রোডের পাশে ক্লাব তাঁবু সংস্কার করে তাদের স্পর্শ করার চেষ্টা করেছেন মহামেডান স্পোর্টিং কর্তারা। তবে লাল-হলুদ অনেক সংগঠিত ভাবে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তাদের পরিকাঠামোর কাজ। আশা করা যায়, বছরখানেকের মধ্যে পরিকাঠামোর দিক থেকে আরও এগিয়ে যাবে শতাব্দীর প্রাচীন ক্লাব ইস্টবেঙ্গল। ক্লাব সচিব কল্যাণ মজুমদারের পাশাপাশি ইস্টবেঙ্গলকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন কার্যকরীর কমিটির সদস্য দেবব্রত সরকার, যিনি ময়দানের নীতু নামে পরিচিত। পল্টু দাসের যোগ্য শিষ্য ছিলেন দেবব্রত। প্রয়াত সচিব পল্টু দাসের মতোই দেবব্রত সবাইকে নিয়ে ক্লাবের কাজ করার ব্যাপারে বিশ্বাসী। এমনকী কোনও পদে না থেকে পিছনে থেকেই ইস্টবেঙ্গলের অগ্রগতির জন্য নীরবে কাজ করে চলেছেন দেবব্রত। তাঁর পরিকল্পনাতেই ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে লাইব্রেরি, আর্কাইভ, লাউঞ্জ এবং প্রয়াত কৃশাণু দের নামে ভিআইপি বক্স করা হয়েছে। আগামী দিনে ইস্টবেঙ্গল যে আরও গঠনমূলক কাজ করে এগিয়ে যাবে তা বলাই বাহুল্য। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের একশো তিন বছরে ইতিহাসে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি নানাভাবে, নানা সময়ে এসে কিছু না কিছু ভালো কাজ করে গেছেন। তাঁদের প্রায় সবাই আজ প্রয়াত। জেসি গুহ, নৃপেন দাস, পল্টু দাস, প্রয়াত হয়েছেন। কিন্তু তাঁদের দেখানো পথকেই আদর্শ করে এগিয়ে চলেছেন বর্তমান লাল-হলুদ কর্তারা।

মরণোত্তর সম্মান ওপার বাংলা মুন্নাকে

আজও চোখে ভাসে উজ্জ্বল, সুঠাম চেহারাটি

জয়ন্ত চক্রবর্তী
এডিটর ইন চিফ, নিউজ বর্তমান

পোশাকি নাম মোহাম্মাদ মোনেম মুন্না, ফুটবল দুনিয়া তাকে চেনে মুন্না নামেই। বাংলাদেশে মুন্নার মত সেন্টার ব্যাক কেউ ছিল না, ভবিষ্যতে কেউ হলেও তাঁকে বেশি পরিশ্রম করতে হবে। এই মুন্না ওপার বাংলা ছেড়ে তিন দফায় ইস্টবেঙ্গলের জার্সি গায়ে দিয়েছেন— উনিশশো একানব্বই, তিরানব্বই আর পঁচানব্বই সালে। ইস্টবেঙ্গলের লাল-হলুদ জার্সিতে মুন্নার উজ্জ্বল, সুঠাম, ব্যক্তিত্ববান চেহারাটি মনে আছে, দেখা হলেই একগাল হাসি দিয়ে অভ্যর্থনা জানাতেন সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরে,— দাদা, ভালো আছেন। উনিশশো ছিয়াশি থেকে উনিশশো সাতানব্বই সাল পর্যন্ত বাংলদেশের জাতীয় দলে কেউ তাঁর জায়গা কাড়তে পারেনি, ইস্টবেঙ্গলেও যে তিন মরশুম খেলেছেন মুন্না তা স্মরণে থাকার মত, কি তাঁর ট্যাকেল, কি তাঁর ডিফেন্সিভ ব্লক— বাংলাদেশে সম্ভবত প্রথম বল ছাড়া ফুটবল খেলার প্রবর্তক হিসেবে মুন্নার নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকতে পারে, সাথে কি বাংলাদেশের ফুটবল অনুরাগীরা কিং ব্যাক নামে ডাকতেন তাঁদের প্রিয় ফুটবলারকে। মাত্র আটত্রিশ বছর বয়সে মুন্না চলে যাবেন কে ভেবেছিলো? দুররোগ্য কিডনির অসুখে ভুগছিলেন, দু'হাজার পাঁচ সালের বারোই ফেব্রুয়ারি প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিটে সংবাদ প্রতিদিন দপ্তরে পি টি আই আর ইউ এন আই মেশিনের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলাম। হঠাৎ মেশিনের বেল বেজে উঠলো, উল্লেখযোগ্য খবর থাকলে তখন এই রকম বেল বাজতো, জরুরি খবর ভেবে ঝুঁকে পড়লাম মেশিনের ওপর, জরুরি খবরই বটে— বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল মুন্না ইস নো মোর ... অকাল মৃত্যুর কথা প্রায়ই বলা হয়, কিন্তু এই খবরটি যেন আমাকে নাড়িয়ে দিয়ে গেল, কি এমন বয়স হয়েছিল মুন্নার। চলে যাওয়ার বয়স তো নয়ই, মনে পড়ে যাচ্ছিলো ইস্টবেঙ্গলের জার্সি গায়ে দিয়ে মুন্নার বেশ কিছু স্মরণীয় ম্যাচের কথা। মনে পড়ে যাচ্ছিলো তার সুদর্শন চেহারার কথা, বিপক্ষের ফরওয়ার্ড তাঁকে টপকে গোল করলেও মাথা ঠাণ্ডা রাখতেন মুন্না। আমার সাংবাদিকতার জীবনে ঠাণ্ডা মাথার ফুটবলার যে ক'জনকে দেখেছি, মুন্না তাদের মধ্যে অন্যতম, দু'হাজার আট সালে ঢাকার ধানমুন্ডির আট নম্বর রাস্তাটা মুন্নার নামাঙ্কিত হয়, জানি না আজ এই রাস্তা ধরে যাঁরা যান তাঁদের মাথাটা বিনম্র শ্রদ্ধায় নত হয়ে আসে কিনা? নারায়ণগঞ্জের ছেলেটি যে একদিন দেশের জার্সি পরে খেলবে কেউ কি ভেবেছিলো? ইস্টবেঙ্গল ক্লাব মুন্নাকে মরণত্তর সম্মান জানাচ্ছে, এর থেকে ভালো আর কি হতে পারে, মুন্নার স্ত্রী ইয়াসমিন সুরভি গ্রহণ করবেন সেই সম্মান, ইস্টবেঙ্গল ক্লাবকে সেকেন্ড হোম বলতেন মুন্না, বাড়ির লোক বাড়ির লোকের হাতে খেতাব তুলে দেবে— এর থেকে পরম মুহূর্ত আর কি হতে পারে।

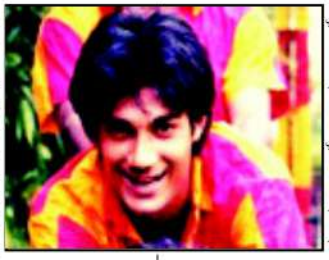

লাল-হলুদ জার্সি গায়ে মাঠ মাতিয়ে ছিলেন মুন্না

কুশল চক্রবর্তী
ক্রীড়া সাংবাদিক

শতবর্ষ অতিক্রান্ত এক ক্লাব। অবশ্যই তাতে খেলে গেছে অজস্র দেশি বিদেশি ফুটবল তারকা। তার মধ্যে কেউ কেউ যেন ইস্টবেঙ্গল জনতার মনের মণিকোঠায় চিরকালীন স্থান করে নিয়েছে। ফুটবলে গোল যারা করে তারা সাধারণত অনেক বেশি জনপ্রিয় হয়। কিন্তু যে খেলোয়াড় বিপক্ষ দলের আক্রমণ রুখেই দর্শকদের হৃদয় জিতে নেয় তার কথা তো আলাদাভাবে বলতেই হবে। ইস্টবেঙ্গলে খেলে যাওয়া মানেম মুন্না এমনই একজন খেলোয়াড়। সেটা ১৯৯১ সালের কথা, কলকাতার তিন বড় ক্লাব গিয়েছিল ঢাকায় ক্লাব কাপ খেলতে। সেখানে তারা ব্যর্থ হলেও সেই প্রতিযোগিতাতে বাংলদেশের কিছু খেলোয়াড়ের খেলা দেখে ইস্টবেঙ্গল নিয়ে আসে বাংলাদেশের আবাহনীক্রীড়া চক্রের তিন খেলোয়াড়কে। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের তৎকালীন সর্বময় কর্মকর্তা শ্রদ্ধেয় পলটু দাসের সাথে চিরকালই ছিল প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশের ক্লাব আবাহনীক্রীড়া চক্রের গভীর সুসম্পর্ক। তাই বাংলাদেশ থেকে ইস্টবেঙ্গল কর্মকর্তারা নিয়ে এলেন মানেম মুন্না,রুমি আর আসলামকে। সে বছর কৃশানু বিকাশের সাথে মুন্না যে খেলা খেলেছিলেন তা আজও তৎকালীন মাঠে থাকা মানুষদের স্মৃতিতে জ্বলজ্বল করছে। আসলে ১৯২৬ সালের ৯ জুন বাংলাদেশের নারায়ণগঞ্জে জন্মানো মানেম মুন্না ছিলেন ফুটবলের এক অসাধারণ খেলোয়াড়।

খেলোয়াড় জীবনের প্রথমে রাইট ব্যাক বা লেফট ব্যাকে খেললেও, পরবর্তী সময়ে স্টপার বা ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার হিসাবেও অনবদ্য হয়ে উঠেছিলেন। ১৯৮০-৮১ সালে পাইওনিয়ার লিগে আত্মপ্রকাশ করেন তিনি। ১৯৮৪ সালের অনূর্ধ্ব-১৮ বাংলাদেশ দলের প্রশিক্ষণ শিবিরে তিনি সবার নজর কাড়েন। সেই বছরই যোগদান করেন বাংলাদেশের ক্লাব মুক্তি যোদ্ধা সংসদে। তারপরে দুবছর মুক্তি যোদ্ধা সংসদে খেলে তিনি যোগদান করেন বাংলাদেশের আরেক ক্লাব ব্রাদার্স ইউনিয়নে। ১৯৮৭ সালে বাংলাদেশের প্রথিতযশা ক্লাব আবাহনী ক্রীড়াচক্রে যোগদান করেন। আজীবন তিনি এই ক্লাবেই খেলছেন। মাঝে এসেছিলেন কলকাতার ইস্টবেঙ্গলে ১৯৯১ সালে খেলতে। বাংলাদেশের হয়ে তিনি ১৯৮৬ সাল থেকে ১৯৯৭ সাল অবধি খেলছেন। যে দলেই তিনি খেলছেন সহ খেলোয়াড়দের থেকে পেয়েছেন অকুণ্ঠ প্রশংসা। বাংলাদেশের এক সময়ে জার্মান কোচ অটো ফিসটার মুন্নাকে দেখে বলেছিলেন, "ভুল দেশে জন্মেছ তুমি।" কলকাতায় তার প্রতিভা দেখে মুগ্ধ হয়ে ইস্টবেঙ্গলের কোচ নঈমুদ্দিন। ১৯৯১ সালে তাঁকে লিবেরো পজিশনে খেলিয়ে ছিলেন। সেখানেও তিনি ছিলেন একই রকম সাবলীল।

১৯৯১-৯২ এর পর তিনি আবারও ইস্টবেঙ্গলের জন্য খেলছেন ১৯৯৩ আর ১৯৯৫ সালেও। তবে ১৯৯১ সালে তিনি, কি স্টপার কি ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার হিসাবে নিজের জাত চিনিয়ে দিয়েছিলেন। ভারতীয় ফুটবল দলের এক সময়ের অপরিহার্য মিডফিল্ডার প্রসূন ব্যানার্জি মুন্নাকে দেখে বলেছিলেন, "উচ্চতা তেমন না হলেও ওর হেডিং আর ট্যাকেল খুব ভালো ছিল আর বল কন্ট্রোল তো দেখার মতো।" একজন ভালো ফুটবলার হতে গেলে আর কি চাই। অতএব, কলকাতার ময়দানে মুন্না হয়ে উঠেছিলেন একজন প্রকৃত হিরো।

দুঃখের কথা মাত্র ৩৯ বছর বয়সে কিডনির রোগে আক্রান্ত হয়ে সকলের মায়া কাটিয়ে চিরশান্তির দেশে চলে যান মানেম মুন্না। সেটা ছিল ২০০৫ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি। অকাল প্রয়াণ ঘটলেও মুন্নার খেলা আজও থেকে গেছে কলকাতার ফুটবল সমাঝদার মানুষের হৃদয়ে। লাল-হলুদ জার্সি পরা মানেম মুন্না আজও যেন ইস্টবেঙ্গলের অগণিত সভ্য সমর্থকদের কাছে এক জীবন্ত আনন্দের ফুটবলার।

জীবনকৃতি সম্মান পেয়ে অভিভূত তরুণ

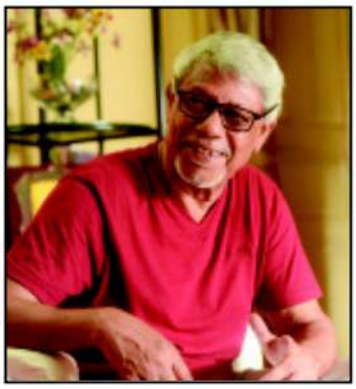

সমাচার প্রতিবেদন : কলকাতা তথা ভারতীয় ফুটবলে ভাস্কর গাঙ্গুলী এক অতি পরিচিত নাম। কিন্তু সেই ভাস্কর গাঙ্গুলিকে ভারতীয় ফুটবলে ভাস্বর করে দিয়েছিলেন যিনি তিনিও ছিলেন এক গোলরক্ষক। তাঁর নাম তরুণ বসু। তিনি না থাকলে হয়তো ইস্টবেঙ্গল জার্সি গায়ে চড়িয়ে ভারতীয় ফুটবলে ভাস্করের নতুন সূর্যের মতো উদিত হওয়ার সুযোগ থাকতো না। হয়তো চিরকালের মতো হারিয়েই যেতেন সেই দিনের ভাস্কর। না, তা হতে দেননি তৎকালীন সময়ে লাল-হলুদ গোলরক্ষক তরুণ বসু।

চলতি বছরে সেই তরুণ বসুকে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব জীবন কৃতি সম্মান দিল। মাত্র চার বছর লালহলুদ জার্সি গায়ে ১০৪ বছরের ক্লাবের কাছ থেকে এই সম্মান পেয়ে অভিভূত ময়দানের একরোখা গোলরক্ষকটি। আর তাঁর হাতে এই সম্মান তুলে দিয়ে কলকাতা তথা ভারতীয় ফুটবলে এক নতুন নজির সৃষ্টি করলেন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের কর্তারা।

তরুণ বসুর পরিবারের আদি বাস ছিল বর্তমান বাংলাদেশের যশোর জেলায়। তবে তাঁর জন্ম উত্তর কলকাতার শ্যামবাজারে। চার ভাই ও তিন বোনের মধ্যে তরুণ ছিলেন সবচেয়ে ছোটো। বসু পরিবারের সেই ছোটো ছেলেটা শিশু বয়স থেকেই ছিলেন বেশ ডানপিটে। আর ফুটবল খেলার প্রতিও ছিল বিশেষ আকর্ষণ। ফুটবলের প্রতি শিশু তরুণের এই উৎসাহ ও উদ্দীপনা নজরে পড়ে কাশীনাথ ঘোষের। তরুণ ভবানীপুর প্লেয়ার্স কর্নারে খেলতেন।

গুরু তরুণ বোসকে শুভেচ্ছা শিষ্য ভাস্কর গাঙ্গুলীর। সৌজন্যে : বর্তমান

কাশীনাথবাবু জহর চিনতে ভুল করেননি। তাঁরই হাত ধরে এরপর সেদিনের বসু বাড়ির ছোট্ট ডানপিটে ছেলেটি যোগ দেন চন্দ্র মেমোরিয়াল ক্লাবে (ময়দানে পরবর্তীকালে এই ক্লাবের নাম পরিবর্তন হয়ে হয় রেলওয়ে এফসি)। সালটা ১৯৬২। এরপর উল্কার গতিতে উত্থান তাঁর। চতুর্থ ডিভিশনে খেলা শুরু করে মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যেই ১৯৬৭ সালে তিনি যোগ দেন ময়দানে ফুটবল তৈরির আঁতুরঘর বলে পরিচিত বালি প্রতিভা ক্লাবে।

সেখানে পর দু'বছর বালি প্রতিভাত থেকে নিজের প্রতিভাকে আরও প্রতিভাত করে তরুণ যোগ দিয়েছিলেন সেই সময়কার জায়ন্ট কিলার রাজস্থান ক্লাবে। মাত্র এক বছর সেখানে খেলার পর ১৯৭০ সালে রাজস্থান থেকে তিনি আস্তানা গাড়েন খিদিরপুর ক্লাবে। তৎকালীন খিদিরপুর ক্লাবের অন্যতম কর্তা ভূতনাথ বিশ্বাসের হাত ধরেই সেই ক্লাবে যোগ দেন তরুণ বসু। তখন খিদিরপুর দলের প্রশিক্ষণের দায়িত্বে ছিলেন প্রয়াত অচ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায়।

কিংবদন্তি কোচকে প্রশিক্ষক হিসেবে পেয়ে যুবক তরুণ তখন বারপোস্টের নিচে এক উজ্জ্বল ধ্রুবতারা হয়ে জ্বলতে শুরু করেছেন। তাঁর অসাধারণ পারফরম্যান্স নজর এড়ায়নি তৎকালীন দুই বড় ক্লাবের কর্তাদের।

১৯৭১ সাল দলদবলের বাজারে খিদিরপুরের জার্সি গায়ে দুরন্ত খেলা তরুণ বসুকে দলে নেওয়ার জন্য ঝাঁপালেন লাল হলুদের তৎকালীন কর্তারা। কিন্তু সেই বছর লাল-হলুদ জার্সি গায়ে তোলা হয়নি এই গোলরক্ষকটির। পড়শি ক্লাবে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। বড় ক্লাবের জার্সি গায়ে বড় ম্যাচে দ্বিতীয় গোলরক্ষক হিসেবে মাঠে নেমে অসাধারণ ফুটবল খেলেছিলেন তিনি। মূলত তাঁর বিশ্বস্ত হাতই পড়শি ক্লাবকে রক্ষা করেছিল বড় ব্যবধানে হারার হাত থেকে।

এরপর ৭৫ সালে তরুণ বসু যোগ দেন লাল-হলুদ শিবিরে। ইস্টবেঙ্গল তখন ভারতবর্ষের ফুটবলে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। স্বদেশি দলের পাশাপাশি বিদেশি দলকেও হারিয়ে নতুন নতুন নজির গড়ছে তারা। লাল-হলুদ জার্সি গায়েও তরুণ যেন আরও সপ্রতিভ হয়ে উঠলেন। পর পর ছ'বার লিগ জয়ের রেকর্ড করা সেদিনের সেই ইস্টবেঙ্গল দলে তিনিও ছিলেন অন্যতম কাণ্ডারি।

এর মধ্যে ১৯৭৫-এর আইএফএ শিল্ড ফাইনালে পড়শি ক্লাবকে ৫-০ গোলে পরাজিত করে মশাল বাহিনী। সেই ম্যাচে বিপক্ষ দলের হয়ে একাই চারটি গোল হজম করেছিলেন ভাস্কর গাঙ্গুলি নামক এক তরুণ গোলরক্ষক। তারপর সবাই যখন ধরে নিয়েছিলেন বিপক্ষে দলে থাকা ভাস্কর হয়তো চিরদিনের মতো ময়দান থেকে হারিয়ে যাবেন। কিন্তু তা হতে দেননি লাল-হলুদ কর্তারা। ৭৬-র মরশুমে ভাস্করকে দলে নিলেন তাঁরা। মাঠে ভাস্করকে পরবর্তীতে ভারতীয় ফুটবলের নক্ষত্র করে তোলার গুরুদায়িত্ব নিয়েছিলেন তরুণ বসু। নিজের যোগ্য উত্তরসূরি ভাস্করকে তৈরি করে ৭৭-এ আবার লাল-হলুদ ছেড়ে যোগ রেড রোডের ধারের মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবে। ৭৮-এ আবার ফিরে এসেছিলেন তাঁর প্রিয় ক্লাব ইস্টবেঙ্গলে। মাত্র দুই বছর থেকে ৮০ সালে তরুণ বসু ফিরে যান খিদিরপুর ক্লাবে। সেখান থেকে ৮২-যান উয়াড়িতে যোগ দিয়ে ফুটবলকে চিরদিনের মতো বিদায় জানান সাতের দশকের ময়দানের সেরা গোলরক্ষক তরুণ বসু।

শুধু ক্লাব ফুটবল নয়, তরুণ বসু খেলেছেন সুব্রত কাপ সন্তোষ ট্রফির পাশাপাশি দেশের জার্সি গায়েও বহু আন্তর্জাতিক ম্যাচ। তবে তাঁর অসাধারণ গোলরক্ষা করার সেই ভঙ্গিমা আজও ময়দান ভোলেনি। ভোলেনি কলকাতার ফুটবলপ্রেমী মানুষেরা। যাঁরা তাঁর খেলা দেখেছেন তাঁরা প্রত্যেকে এখনও দীপ্ত কণ্ঠে স্বীকার করেন তরুণ বসু ছিলেন ভারতীয় ফুটবলের গর্ডন ব্যাঙ্কস।

আবেগাপ্লুত হয়ে পড়লেন স্বল্পভাষী সেই গোলরক্ষকটি। বললেন, আমি সত্যিই বলছি, ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের এই সম্মান পেয়ে আমি অভিভূত। যা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না।

ব্রান্ড ইস্টবেঙ্গল

নতুন সাজে ইস্টবেঙ্গল তাঁবু

গ্রন্থাগার

কনফারেন্স রুম

ড্রেসিং রুম

কাফেটোরিয়া

নয়া সাজে ইস্টবেঙ্গল মাঠ,
গ্যালারি ও ফ্লাড লাইট

বাস

ব্রান্ড ইস্টবেঙ্গল

আর্কাইভ

মেম্বার্স লাউঞ্জ

সিনিয়র ও প্রতিবন্ধীদের জন্য লিফট

জিম

জাকুজি

জীবনকৃতি সম্মান হৃদমাঝারে রেখে দেবেন অরূপ

সমাচার প্রতিবেদন : আটের দশকে বাংলা ক্রিকেটের উজ্জ্বল ইতিহাসের পাতায় যে ক'জন বাঙালি ক্রিকেটের নাম ধ্রুবতারার মতো জ্বল জ্বল করছিল অরূপ ভট্টাচার্য ছিলেন তাঁদের অন্যতম। রাজ্য ও ক্লাব ক্রিকেটে সফল এই প্রাক্তন ক্রিকেটারকেই এবার জীবন কৃতি সম্মানে ভূষিত করতে চলেছে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব। সেই সম্মান তাঁকে দেওয়া হবে জেনে যেন বেশ কিছুটা গর্বিত এবং আবেগপ্লুত বাংলার এই প্রাক্তন স্পিনারটি। আর নিজের সেই অভিব্যক্তির কথাই শোনালেন তিনি— প্রথমেই অরূপ ভট্টাচার্যর সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে উঠে এল চলতি বছর ইস্টবেঙ্গল ক্লাব তাঁকে জীবন কৃতি সম্মান দিচ্ছে। হৃদয়ের কোন জায়গায় রাখবে এই সম্মাননাকে। কথার মাঝেই লক্ষ্য করলাম ময়দানে সবার প্রিয় গদা (অরূপদার ডাকনাম) যেন কিছুটা আনমোনা হয়ে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করতে লাগলেন। তারপর প্রশ্নটা শেষ হওয়া মাত্র আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠে লাল-হলুদের প্রাক্তন ক্রিকেট অধিনায়ক বলতে শুরু করলেন, সত্যি কথা বলতে কি আমি অভিভূত, আনন্দিত। আর তার চেয়েও বড় ব্যাপার আমি গর্বিত। ইস্টবেঙ্গল ক্লাব যে এই সম্মানের জন্য আমার নাম মনোনীত করেছে আমি তার জন্য ক্লাবের কাছে আজীবন কৃতজ্ঞ থাকব। আর ক্লাবের দেওয়া এই সম্মাননা আমার কাছে জীবনের সব পুরস্কারের থেকেও বড়। কাজেই এই সম্মান আমার হৃদ-মাঝারে থেকে যাবে আজীবন।

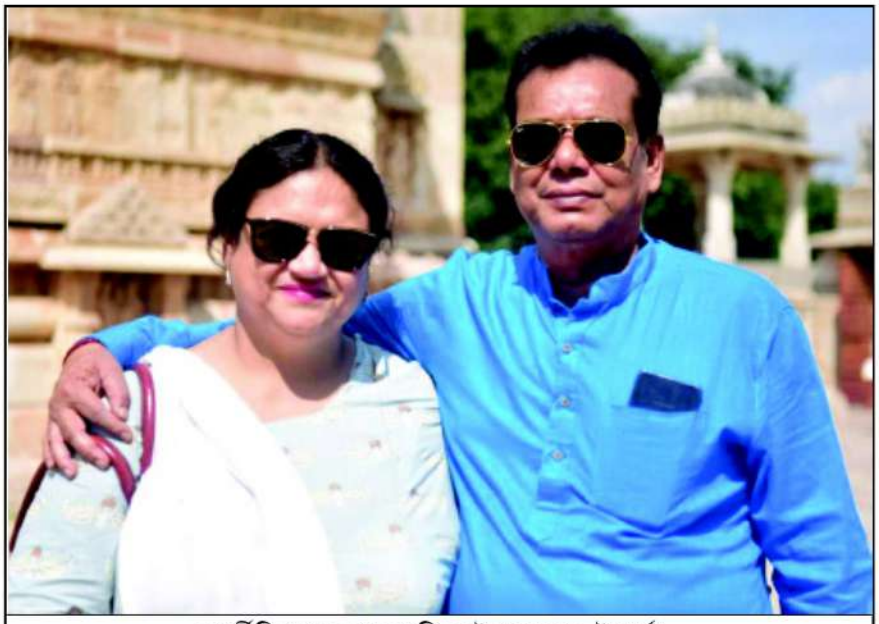

সধর্মীনির সঙ্গে প্রাক্তন ক্রিকেটার অরূপ ভট্টাচার্য।

না, এখনও আমি ভাবতে পারছি না আমি এই সম্মান পাবো। আর প্রিয় ক্লাবের দেওয়া এই সম্মাননা আমার কাছে জীবনের সব থেকে বড় পুরস্কার বলে আমি মনে করি। কেননা যে ক্লাবের জার্সি গায়ে ছোটবেলা থেকে খেলার স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকতাম। সেই ক্লাবের থেকে এই রকম সম্মাননা পাওয়া আমার জীবনের বিরাট পাওনা।

এরপর যেন আরও জীবনের সেই ফ্ল্যাশ ব্যাকে ফিরে গেলেন প্রাক্তন ইস্টবেঙ্গল অধিনায়ক। বললেন, আমি ছোটো থেকেই ইস্টবেঙ্গলের সাপোর্টার। তার অন্যতম কারণ আমার পরিবারের সকলের জন্মস্থান ওপার বাংলায়। কাজেই ইস্টবেঙ্গল ক্লাব যে আমার প্রতিটি শিরায়, শিরায়, ধমনীতে থাকবে এটাই স্বাভাবিক। তাই আমি যখন ক্রিকেটার হওয়ার স্বপ্ন দেখতাম দিনরাত তখন থেকেই আমি ভাবতাম জীবনে আর কিছু পারি না পারি আমার প্রিয় ক্লাবের হয়ে আমি যাতে একবার অন্তত ক্রিকেট খেলতে পারি। ভগবান আমার সেই ইচ্ছা পূরণ করে দিয়েছেন।

আর সেই ক্লাবের জার্সি গায়ে একটা বা দুটো বছর নয়, বহু বছর যেমন খেলেছি, তেমনিই হয়েছি অধিনায়কও। এটাই তো আমার কাছে অনেক পাওয়া। আমি এখনও বলছি, আগেও বলেছি এবং ভবিষ্যতেও বলব, ফুটবল বা ক্রিকেট যে খেলাই হোক না কেন প্রত্যেক খেলোয়াড়দের কাছেই ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের জার্সি পরে খেলার মতো গৌরব আর কিছু হতে পারে না। আর আমি এটাও মনে করি যে আমার ইস্টবেঙ্গল ক্লাব শুধু কলকাতা নয়, ভারতবর্ষ নয়, আমার ক্লাব বিশ্বসেরা।

এইসব স্মৃতিচারণা শেষ হতেই, লাল-হলুদের প্রাক্তন ক্রিকেট অধিনায়ক ফিরে গেলেন ১৯৯৫ সালের পি সেন ট্রফির কথায়। এই ম্যাচটার প্রসঙ্গেই তো আমি আপনার কাছে জানতে চাইব বলে ঠিক করেছিলাম। কথা শেষ হতেই অরূপ ভট্টাচার্য আবার যেন ফিরে গেলেন নয়ের দশকে।বললেন, সেবার পি সেন ট্রফিতে তৎকালীন ভারতের জাতীয় দলের বহু খেলোয়াড় অংশ নিয়েছিলেন। সেই তালিকায় কপিলদেবের মতো বিশ্ব তারকারা যেমন ছিলেন, ছিলেন শচীনের মতো ক্রিকেটাররাও।

সেই টুর্নামেন্টে ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের পাশাপাশি দুরন্ত দল গড়েছিল এরিয়ান্স। আমরা এরিয়ান্সকে হারিয়ে মুখোমুখি হই। চির প্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগানের বিরুদ্ধে। ইডেনে সেই ম্যাচ দেখতেই তো প্রায় ৯০ হাজারের দর্শক এসেছিলেন। আমি দুই ম্যাচ মিলিয়ে ছ'টি উইকেট নিয়েছিলাম। সবশেষে অরূপ ভট্টাচার্য আবারও বললেন, আমার ক্লাব ইস্টবেঙ্গল। ইস্টবেঙ্গল ছাড়া অন্য কিছু ভাবিনি আর ভাবতেও চাই না। পর জন্ম আছে কিনা তা জানি না। যদি থাকে, তবে ঈশ্বরের কাছে আমার একান্ত প্রার্থনা, ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের অধিনায়ক হয়ে আবার যেন ব্যাট-বল হাতে মাঠে নামতে পারি।

অপ্রতিরোধ্য গুরপ্রীতে নবমবার সাফ কাপ জয় ভারতের

সমাচার প্রতিবেদন : আন্তঃ মহাদেশীয় কাপের পর সাফ কাপ চ্যাম্পিয়নশিপ অপ্রতিরোধ্য ভারতীয় দলের বিজয়রথ। ৪ জুলাই ২০২৩ মঙ্গলবার বেঙ্গালুরুর কান্তিরাভা স্টেডিয়ামে নৈশালোকে আয়োজিত ফাইনালে ভারত সাডেন ডেথে ৫-৪ গোলে কুয়েতকে হারিয়ে সাফ-কাপে চ্যাম্পিয়ন হল। নির্ধারিত ৯০ মিনিট এবং অতিরিক্ত ৩০ মিনিট খেলার ফলাফল ছিল ১-১। ১৪ বারের সাফ কাপ টুর্নামেন্টে এবার নিয়ে ভারত চ্যাম্পিয়ন হল ৯ বার। নবমবার সাফ কাপে ভারতকে চ্যাম্পিয়ন করতে বড় ভূমিকা নিয়েছেন গোলরক্ষক গুরপ্রীত সিং সান্ধু। বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে ক্রোয়েশিয়া এবং ফাইনালে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে টাইব্রেকারে দুরন্ত সেভ করে আর্জেন্টিনাকে চ্যাম্পিয়ন করেছিলেন গোলরক্ষক এমিলিয়ানো পুনরাবৃত্তি। সেমিফাইনালে লেবাননের বিরুদ্ধে টাইব্রেকারে জয় এনে দেওয়ার পর ফাইনালে কুয়েতের বিরুদ্ধে সাডেন ডেথ-এ গুরপ্রীতের সোনার হাতেই সাফ কাপে চ্যাম্পিয়ন খেতাব অর্জন করল ইগর স্টিমাচের ভারতীয় দল। প্রথমে ইম্ফলে হিরো ত্রিদেশীয় কাপ। তারপর ভুবনেশ্বরে হিরো ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপ। ৪ জুলাই বেঙ্গালুরুতে সাফ কাপ জয়। এর আগে ভারত কখনও পরপর তিনটি টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয়নি। যাঁর কোচিংয়ে ভারত ফিফা র‍্যাঙ্কি ৯৯ স্থানে থাকার পাশাপাশি টানা তিনটি ট্রফিতে চ্যাম্পিয়ন সেই ইগর স্টিম্যাচ কার্ড সমস্যার জন্য ছিলেন গ্যালারিতে। সহকারী কোচ মাহেশ গাউলির নির্দেশে সেমিফাইনালে লেবানন এবং ফাইনালে কুয়েতের মতো কঠিন প্রতিপক্ষকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়াটা সত্যিই ভারতীয় ফুটবলে সোনালি আলোর রেখা। গ্রুপ লিগে ভারত-কুয়েত ম্যাচটি শেষ হয়েছিল ১-১ গোলে। এগিয়ে থেকেও জয় পায়নি ইগর স্টিম্যাচের দল। ফাইনালে শুরু থেকে ভারতের বিরুদ্ধে আক্রমণে ঝড় তোলে কুয়েত ফুটবলাররা। ১৪ মিনিটে গোল করে কুয়েতকে এগিয়ে দেন আল খালাদি। পিছিয়ে পড়েও হাল ছাড়েনি ভারতীয় ফুটবলাররা। বিশেষ করে অধিনায়ক সুনীল ছেত্রী, ছাংতে, আনোয়ার, অনিরুদ্ধ থাপা, সন্দেশ জিঙ্গান, ডিকেসন, মেহতাব সিং। ৩৮ মিনিটে গোল শোধ ভারতের। গোলটি শোধ করেন ২৬ বছর বয়সী ফুটবলার লালিয়ান জুয়ালা ছাংতে। সাফ কাপ ফাইনালের দিন ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন ছাংতেকে বর্ষসেরা ফুটবলার নির্বাচিত করেছেন। স্টিমাচ ফাইনালে গোল করে তারই যেন যোগ্য মর্যাদা দিলেন ছাংতে। ২৬ বছর বয়সী ফুটবলার ছাংতের নামটা বর্ষসেরা ফুটবলার হিসেবে লিখে ফেডারেশনের কাছে পাঠিয়ে ছিলেন কোচ ছাংতে গুরুদক্ষিনা দিলেন। টাইব্রেকারে ভারতের হয়ে গোল পাঁচটি করেন সুনীল ছেত্রী, সন্দেশ জিঙ্গান, ছাংতে, নাওরেশ এবং মহেশ সিং। গোল করতে ব্যর্থ উদান্ত সিং। কুয়েতের হয়ে গোল করেন কুতাবি, ধেফিরি, নাজি এবং খালেনি। টাইব্রেকারে মিস করেন দাহাম, আর সাডেন ডেথএ ইব্রাহিমের শট ঝাঁপিয়ে ভারতের সাফ কাপে নবমবার চ্যাম্পিয়ন করেন গুরপ্রীত সিং। এবারই সাফ বহির্ভুত দেশ কুয়েতকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন খেতাব অর্জন করল ইগর স্টিম্যাচের ভারতীয় দল। ভারতীয় দলের জার্সি গায়ে ৯২টি গোল করেন সুনীল ছেত্রী। সাফ কাপ টুর্নামেন্টে সেরা খেলোয়াড় ও সর্বোচ্চ গোলদাতার পুরস্কার পান সুনীল।

প্রয়াত চন্দন বন্দ্যোপাধ্যায় ইস্টবেঙ্গলে চিরদিনই সুরভিত

সমাচার প্রতিবেদন : চন্দনের গন্ধ আজও লেগে আছে ইস্টবেঙ্গলের শিরা-উপশিরায়। চন্দন বন্দ্যোপাধ্যায় সেই বিরল মানুষ যাঁর জন্ম এবং মৃত্যু একইদিনে। ১৯৩৬ সালের ২৯ জুন তিনি পৃথিবীতে এসেছিলেন। চলেও গেলেন একই দিনে। কিন্তু সত্যি কি কোথাও গেলেন? না তিনি যাননি কোথাও। চন্দনের আবেশ যে অত সহজে ফুরনোর নয়। পরিবারের কেউ চাননি তিনি ফুটবলার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে উঠুন। কিন্তু হয়ে গেলেন ইস্টবেঙ্গল অধিনায়ক। পরিবারের অমতে ১৯৫৪ সালে কলকাতা ময়দানে তৃতীয় ডিভিশন ক্লাব মিলন সমিতির জার্সি গায়ে তাঁর আবির্ভাব। এরপর ভবানীপুর, জর্জ টেলিগ্রাফে খেলার পর ৬৩-র মরশুমে তিনি সই করেন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে। শুরুর দিকে সেভাবে সুযোগ না পেলেও বেশ কয়েকটি ম্যাচের পর তিনি ইস্টবেঙ্গল ডিফেন্সের ভরসা হয়ে ওঠেন। ৬৬ সালে তিনি ছিলেন ইস্টবেঙ্গল দলের অধিনায়ক। সেবার লিগ এবং আইএফএ শিল্ড চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। ইস্টবেঙ্গলে খেলেছিলেন মাত্র চার বছর। কিন্তু তাতেই চন্দনে মাতোয়ারা ছিল লাল-হলুদ শিবির। ২০১৫ সালে ক্লাবের প্রতিষ্ঠা দিবসে তাঁকে জীবনকৃতি সম্মানে সম্মানিত করেছিল তাঁর প্রিয় ক্লাব ইস্টবেঙ্গল। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর। রেখে গেলেন স্ত্রী, একমাত্র পুত্র, পুত্রবধু, নাতনি সহ অগনিত ইস্টবেঙ্গল সদস্য, সমর্থকদের। যতদিন বেঁচেছিলেন ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ছাড়া অন্য কিছু ভাবেননি। তাই তো ১৯ জুলাই তাঁর স্বরণ সভায় তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে হাজির ছিলেন ইস্টবেঙ্গল ক্লাব কর্তাদের পাশাপাশি প্রাক্তন ফুটবলার সহ বহু সদস্য, সমর্থকরা প্রত্যেকের স্মৃতিচারণে উঠে এসেছে চন্দন বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনেক অজানা গল্প। স্মৃতিচারণ থেকেই বোঝা যায় চন্দনের গন্ধ জেগে থাকবে ফুটবলের জন্য। ছিলেন সচিব কল্যাণ মজুমদার, কার্যকরি কমিটির সদস্য দেবব্রত সরকার।

স্মরণ সভায় চন্দন বন্দ্যোপাধ্যায়কে শ্রদ্ধার্ঘ্য সচিব কল্যাণ মজুমদারের। রয়েছেন ইস্টবেঙ্গলের কার্যকরী কমিটির সদস্য দেবব্রত সরকার, কৃষ্ণেন্দু রায়।

স্মরণ সভায় চন্দন বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রীর হাতে মরোণত্তর মানপত্র তুলে দিচ্ছেন সচিব কল্যাণ মজুমদার, কার্যকরী কমিটির সদস্য দেবব্রত সরকার।

চন্দন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে কে কী বললেন-

শ্যাম থাপা: ১৯৬৬-ত আমি যখন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের নতুন প্লেয়ার, একদম ছোট্ট বয়েস ছিল আমার। তখন আমাকে নানাভাবে গাইড করেছিলো চন্দন দা। উনি সেই বছর ছিলেন ক্লাবের অধিনায়ক। লিগের খেলায় রাজস্থানের বিপক্ষে হ্যাটট্রিক করার পর চন্দনদা আমাকে কোলে তুলে নিয়েছিলেন। প্রতি ম্যাচে আমাকে ভীষণভাবে উদ্বুদ্ধ করতেন চন্দনদা।

ভাস্কর গাঙ্গুলি : চন্দনদা ছিলেন প্রাণবন্ত, সব সময় হাসিখুশি একজন মানুষ। অনেক কঠিন সময়েও সবাই যখন কোনো কিছু নিয়ে খুব চিন্তিত, তখন চন্দনদা এসে খুব সুন্দরভাবে পরিস্থিতি সহজ করে দিতেন। আমার চোখে সব সময় তাঁর সদাহাস্য চেহারাটি ভাসে। আমি তাঁর খেলা না দেখলেও শুনেছি খুব ভালো ফাইটার ছিলেন। ইস্টবেঙ্গল ক্লাব তাঁবুতেই বা যেখানেই চন্দন দার সাথে দেখা হয়েছে, এক মুখ হেসে জড়িয়ে ধরতেন। তাঁর চলে যাওয়াতে আমি ব্যক্তিগতভাবে গভীর শোকাহত।

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য : চন্দনদা ছিলেন আমাদের মতো খেলোয়াড়দের অনুপ্রেরণা। আমি যখন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে খেলতে শুরু করি, চেষ্টা করতাম ক্লাবের প্রাক্তন খেলোয়াড়দের সাথে কথা বলে, তাদের খেলোয়াড়ি দিনগুলোর কথা জানবার। আসলে আমি নিজেকে অনুপ্রাণিত করতাম তাদের লড়াইয়ের ঘটনাগুলো শুনে। বিশেষ করে মোহনবাগানের সাথে খেলার আগে সেই আবেগটা খুব কাজে দিত। চন্দনদা সে সময় আমাকে নানাভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। খুব মনে পড়ছে, ২০১৯-এ ক্লাবের শতবর্ষর অনুষ্ঠানের সময় মঞ্চের সামনে ক্লাবে যখন দেখা হয়েছে হেসে জড়িয়ে ধরে গল্প করেছেন। আজ সেই সব কথা বড্ড মনে পড়ছে।

মিহির বসু : অফুরন্ত জীবনী শক্তিতে ভরপুর ছিলেন চন্দনদা। দীর্ঘদিন ধরে ক্যান্সারে ভুগছিলেন, কিন্তু সেটা কাউকে বুঝতে দেননি, নিজেও সে সবের তোয়াক্কা করতেন না। কিছুদিন আগেও আমার সাথে কথা হয়েছিলো। কি যে ভালো মনের মানুষ ছিলেন বলে বোঝানো যাবে না।

বিকাশ পাঁজি : চন্দনদা ছিলেন আমাদের অভিভাবক। এই তো বছর দুয়েক আগে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সঙ্গে ইনভেস্টরদের চুক্তি নিয়ে কিছু সমস্যা দেখা দিয়েছিল। শতবর্ষ প্রাচীন ক্লাবের হস্তান্তর হওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। আমরা প্রাক্তন খেলোয়াড়রা তখন ক্লাবের পাশে সমবেত হয়েছিলাম, যার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন চন্দন ব্যানার্জি। শুধু নেতৃত্বে থাকাই নয়, দীপ্তকণ্ঠে বলেছিলেন, আমার জীবদ্দশায় ক্লাবের কোনো ক্ষতি হোক সেটা হতে দেবো না। আজ আমরা একজন অভিভাবককে হারালাম।

অলোক মুখার্জি : কলকাতার ময়দানে চন্দন ব্যানার্জীর মতো মানুষ সত্যিই বিরল। ফুটবলার হিসেবে যেমন বড় মাপের ছিলেন, ঠিক তেমনি মানুষ হিসেবেও খুব বড় মনের ছিলেন। বহু ফুটবলারের পাশে দাঁড়িয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন।

বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য : আমার খেলোয়াড় জীবনে চন্দনদার সাথে বেশ কয়েকবার কথা বলার সৌভাগ্য হয়েছিল। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের হয়ে যখন খেলতাম তখন সময় সময় উনি আমাকে নানাভাবে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিলেন। পরবর্তীতে যখন কাস্টমস্-র সাথে যুক্ত থেকেছি, সেখানেও তিনি নানাভাবে আমাকে সাহস দিয়েছেন। আমি দেখেছি, উনি শুধু একজন লিডারই শুধু নন, উনি সবসময় সবার পাশে এসে দাঁড়াতেন।

মালি থেকে ফুটবলারদের বাবা হয়ে উঠেছিলেন শঙ্কর পিল্লাই

অরূপ পাল, ইস্টবেঙ্গল সমাচার

তখনও গোল হয়নি, চিন্তিত শঙ্কর বাবা।

১৯২৪ সালের ১৪ জুলাই দক্ষিণ ভারতের এক অখ্যাত গ্রাম তাঞ্জোরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন শঙ্কর পিল্লাই নামের এক শিশু। সেই তামিল শিশুই একদিন হয়ে উঠেছিলেন ইস্টবেঙ্গল নামক শতবর্ষ পার করা ভারতীয় ফুটবলের অনন্য এক ক্লাবের মহীরুহ। চলতি বছর ইস্টবেঙ্গল ক্লাব পদার্পণ করছে ১০৪ বছরে। আর শঙ্কর পিল্লাই তিনিও চলতি বছরের জুলাইয়ে পদার্পণ করলেন ৯৯ বছরে। আগামী বছর শতবর্ষে পা রাখবেন শঙ্কর বাবা।

ইস্টবেঙ্গল ক্লাব আর শঙ্কর পিল্লাই এই দু'জনের মধ্যে যেন ছিল এক আত্মিক সম্পর্ক। যে সম্পর্ক অটুট ছিল শঙ্কর পিল্লাইয়ের মৃত্যুর দিন পর্যন্ত। ভারতীয় ফুটবল তো বটেই সারা বিশ্বের ফুটবল মানচিত্রে শঙ্কর পিল্লাই এক অনন্য নজির গড়েই চিরকাল থেকে গিয়েছেন। ফুটবলার থেকে কর্তা সকল ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের কাছে শঙ্কর পিল্লাই মালি নয়, ছিলেন বাবা। অর্থাৎ, শঙ্কর বাবা। এই নামেই খ্যাত ছিলেন তিনি।

তাঞ্জোর গ্রামে জন্ম নেওয়া শঙ্কর পিল্লাই নামক শিশুটি জন্ম থেকেই দেখেছিল অভাব আর অভাব। কাজেই পড়াশোনা করে ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার স্বপ্ন দেখা তাঁর কাছে আকাশ কুসুম স্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই ছিল না। যে শিশুটি যখন হাঁটতে শিখেছে, খেলতে শিখেছে, ঠিক তখন থেকেই শঙ্কর পিল্লাই হয়তো বুঝেছিলেন তাঁদের সংসারে পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি। তবুও সংসারের অভাব অনটনকে দূরে সরিয়ে ফুটবলের টানেই এই মাঠ ওই মাঠে দেখা মিলতো তামিল শিশুটিকে।

এই রকমই এক ম্যাচের শেষে শঙ্করকে দেখে কলকাতায় নিয়ে আসেন সেই সময়ের ইস্টবেঙ্গল দলের অন্যতম ফুটবলার লক্ষীনারায়ণ মুর্গেস। তাঁর হাত ধরে কলকাতা শহরে আসা শিশু শঙ্করের। তখন তাঁর বয়স মাত্র ১৪ বছর। প্রথম দিন ক্লাব তাঁবুতে পা দিয়েই লাল-হলুদের প্রতি গভীর প্রেমে পড়ে গিয়েছিলেন সেদিনের সেই শিশুটি। যে প্রেম ছিল রুপাই-সাজুর প্রেমের মতোই নিখাদ। তাই শঙ্কর পিল্লাইয়ের ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের প্রতি তাঁর নিষ্ঠাহীন ভালোবাসা রুপাই সাজুর মতো সবুজ ঘাসের নকশি কাঁথাও রচিত হয়ে আছে ভারতীয় ক্লাব ফুটবলে।

প্রথমে ক্লাবের গ্যালারিতে বসে খেলা দেখার সুযোগ ও কিছু টুকটাক ফাইফর্মাস খাটা। তারপর ক্লাব কর্তাদের নজরে পড়ে জুটল মালির কাজ। ততদিনে শঙ্করের হৃদয়ে স্থায়ীভাবে আরও ঘনিষ্ঠভাবে জায়গা পেতে শুরু করেছে ইস্টবেঙ্গল নামক ক্লাবটি। যে রকম অন্য ক্লাবের মালিরা করে শঙ্কর পিল্লাইও প্রথমে সেই কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। তারপর ধীরে ধীরে ইস্টবেঙ্গল নামক ক্লাবটিকে নিজের মায়ের আসনে বসিয়ে ফেললেন। বটবৃক্ষের মতো ইস্টবেঙ্গল ক্লাবটাকে রক্ষা করার সঙ্কল্প তিনি হয়তো সেইদিনই নিয়েছিলেন যেদিন তিনি প্রথম পদার্পণ করেছিলেন তাঁর প্রিয় ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের তাঁবুটিতে।

মালি হিসেবে কাজ পাওয়ার পর সেদিনের সেই শঙ্করের সঙ্গে লাল-হলুদ জার্সির যে আত্মিক সম্পর্ক ধীরে ধীরে আরও গভীর হতে থাকলো। ক্লাবের ম্যাচ থাকলেই গোল পোস্টের পিছনে গিয়ে বসে থাকতে দেখা যেত তাঁকে। দল যতক্ষণ না গোল করছে ততক্ষণ পর্যন্ত পাগলের মতো ছটফট করতেন তিনি। আর গোল করলেই আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠতে দেখা যেত শঙ্কর পিল্লাইকে। এই দৃশ্য অটুট ছিল যতদিন পর্যন্ত তিনি মাঠে আসতে পেরেছেন ততদিন।

এরপর ধীরে ধীরে লাল-হলুদ খেলোয়াড়দের সঙ্গে সম্পর্ক হয়ে উঠতে লাগলো অত্যন্ত সুমধুর। মৃদুভাষী শঙ্কর পিল্লাইকে আপন করে নিলেন খেলোয়াড়রাও। সাতের দশকের সময় থেকেই লাল-হলুদ দলের সকল খেলোয়াড়দের কাছে শঙ্কর পিল্লাই মালি থেকে হয়ে উঠলেন শঙ্কর বাবা। সমরেশ, গৌতম, সুরজিৎ, শ্যামল, মনোরঞ্জন, ভাস্কর সহ দলের সব ফুটবলারই ছিলেন তাঁর কাছে আদরের সন্তান। আর তিনি ছিলেন তাঁদের সবার প্রিয় শঙ্কর বাবা।

দলের প্রতিটি খেলোয়াড়কে নিজের সন্তান স্নেহে বুকে আগলে রাখতেন তিনি। যেমনটি বাবা করে থাকেন তাঁর সন্তানের জন্য। খেলোয়াড়রা কোন বুট কোনদিন পরে মাঠে নামবেন তা ম্যাচের আগে মাঠ দেখেই বুঝে নিতেন

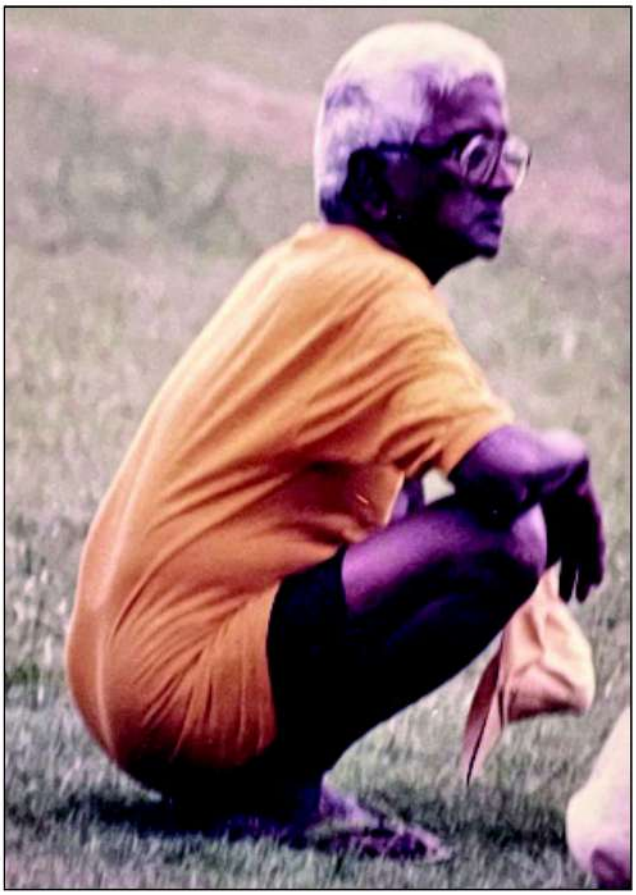

তিনি। ম্যাচের সময় ফুটবলারদের হাতে তুলে দিতেন সেই বুট। শুধু বুট বা লাল-হলুদ জার্সি খেলোয়াড়দের হাতে তুলে দিয়েই ক্ষান্ত থাকতেন না তিনি। পরম স্নেহে বাবার মতো যত্নও করতেন দলের সকল খেলোয়াড়দের। আর সেই উদাহরণও রয়েছে বহু। যেমন সেবার ইস্টবেঙ্গলে প্রথম যোগ দিয়েছেন সমরেশ চৌধুরী। প্রত্যেকের মতো তাঁর চোখেও স্বপ্ন। কিন্তু প্রথম দিকে দলে কিছুতেই খেলার সুযোগ পাচ্ছিলেন না পিন্টু। হতাশা গ্রাস করতে লাগলো তাঁকে। সেই সময় তরুণ সমরেশকে ভরসা জুগিয়েছিলেন শঙ্করবাবা। কোচ না থেকেও মালি হয়েও দলের প্রতিদিনের অনুশীলন দেখে তাঁর মনে হয়েছিল তরুণ পিন্টু সুযোগ পাবেই। একদিন সুযোগ পেয়েও গেল পিন্টু।

সেই সময় ফুটবলে এতটা আধুনিকতার ছোঁয়া স্পর্শ করেনি। খেলোয়াড়রা চোট পেলে তাঁর চিকিৎসার পাশাপাশি ভরসা করতেন অনেক টোটকার ওপরেও। আর সেই বিষয়েও সিদ্ধহস্ত তাঁদের প্রিয় শঙ্করবাবা। একবার দিল্লিতে পড়শী ক্লাবের সঙ্গে খেলার আগের দিন গোড়ালির চোটে কাবু অলোক মুখোপাধ্যায়। সবার মাথায় হাত। এই রকম একটা ম্যাচে অলোক না থাকাটা মানে দলের কাছে বজ্রপাত। কিন্তু হাল ছাড়লেন না শঙ্করবাবা। শুরু করলেন তাঁর ট্রিটমেন্ট। ডিমের সঙ্গে আদা-রসুন সহ আরও বেশ কিছু উপকরণ দিয়ে ওষুধ বানিয়ে সুস্থ করে তুলেছিলেন অলোক মুখোপাধ্যায়কে।

৯২ সালে লাল-হলুদ জার্সি গায়ে খেলতে নামার আগে বিশ্বকাপ জয়ী ভারত অধিনায়ক কপিল দেবকে বুট বেছে দিচ্ছেন শঙ্কর বাবা। রয়েছেন কুলজিৎ সিং।

তারপর বরদুলই খেলতে গিয়ে মনোরঞ্জনের হাত ভাঙল। সেবার মনার হাত ভাঙায় তাঁকে আর পাওয়া যাবে না টুর্নামেন্টের বাকি ম্যাচগুলিতে। তাই ভেবে চোখের জল ফেলে মন খারাপ করে হতাশ হয়েছিলেন শঙ্করবাবা।

তাঁর এই অকৃত্রিম ভালোবাসা শুধু মাঠেই সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়, মাঠের বাইরেও তা ছিল একইরকম বিরাজমান। ইস্টবেঙ্গল দলের প্রাক্তন অধিনায়ক প্রয়াত শ্যামল ঘোষের বিয়ের কথা আজও ময়দানের আনাচে কানাচে শোনা যায়। শ্যামলের বিয়েতে সেদিন বরকর্তা হয়ে বাবার ভূমিকা পালন করেছিলেন শঙ্কর পিল্লাই। তারপর সেই ঘটনা সম্পর্কে শ্যামল ঘোষকে জিজ্ঞাসা করা হলে ময়দানের অজাতশত্রু এই ফুটবলারটি বলতেন শঙ্করবাবা আমার কাছে বাবার থেকে কোন অংশে কম নয়। শঙ্করবাবা আমার বাবাই। এই রকম আরও ঘটনা রয়েছে ময়দানের মিথ শঙ্কর পিল্লাইকে ঘিরে।

বাংলায় একটা কথা প্রচলিত আছে শাসন করা তারই সাজে সোহাগ করে যে। খেলোয়াড়দের কাছে শঙ্করবাবার ভূমিকা ছিল সেই রকমই। কোনও খেলোয়াড় গোল করলেই ম্যাচ শেষে তাঁকে আদরে, স্নেহে বুকে জড়িয়ে ধরতে যেমন কুণ্ঠাবোধ করতেন না, ঠিক তেমনি আবার কেউ খারাপ খেললে তাঁকে বকাঝকাও করতেন। কিন্তু শঙ্করবাবার এই শাসন করা নিয়ে কোন খেলোয়াড়ই কথা বলতেন না। কেননা তাঁরা প্রত্যেকেই মনে করতেন শঙ্কর পিল্লাই তাঁদের বাবাই। সত্যিই এটাই তো বাবারা করে থাকেন তাঁদের সন্তানদের জন্য।

শঙ্কর পিল্লাই ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে বহু খেলোয়াড়দের খেলা দেখেছেন নিজের চোখে। পঞ্চপাণ্ডবের যুগে তাঁর প্রিয় খেলোয়াড় ছিলেন আপ্পারাও। তারপর অবশ্য তাঁর প্রিয় খেলোয়াড়দের তালিকায় ছিলেন সুকুমার সমাজপতি, অসীম মৌলিক, সুরজিৎ সেনগুপ্ত, সুভাষ, শ্যামল, মনোরঞ্জন, ভাস্কর, চিমা, তরুণ, অলোক, সুদীপ, কৃশাণু সহ আরও বেশ কয়েকজন ফুটবলার।

সব মিলিয়ে শঙ্করবাবা মানেই কলকাতা ময়দানের এক কালজয়ী ইতিহাস। যে ইতিহাস বিশ্বের কোনও ক্লাবের মালির আছে কিনা জানা নেই। তবে তাঞ্জোরের শঙ্কর পিল্লাইয়ের আছে এবং থাকবেও চিরকাল। তাই তো আজও ইস্টবেঙ্গল তাঁবু জুড়ে স্মৃতি বিজড়িত হয়ে আছে তাঁর প্রতিটি ঘটনা। ১৯৯৬ সালের ১২ জুলাই, যেদিন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের নব নির্মিত তাঁবু কোন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ছাড়াই শঙ্করবাবাকে দিয়ে উদ্বোধন করিয়েছিলেন লাল-হলুদের কর্তারা। সেদিন তাঁবুর উদ্বোধনে এসে আনন্দে আত্মহারা হয়ে চোখের জল ফেলেছিলেন শঙ্করবাবা।

এরপর নিয়মিত নিষ্ঠুর পরিহাসে এবং কালের নিয়মে যেদিন শঙ্করবাবা (অর্থাৎ, শঙ্কর পিল্লাই) বিদায় নিয়েছিলেন চিরতরে সেদিন থেকে ময়দান হয়েছিল পিতৃহারা। ইস্টবেঙ্গল ক্লাব যে ক্লাবকে মায়ের আসনে স্থান দিয়েছিলেন শঙ্করবাবা, সেই ক্লাবের ফুটবলাররা হয়েছিল সন্তানহারা। ফুটবলার থেকে শুরু করে লাল-হলুদ সমর্থক হারিয়েছিলেন শঙ্করবাবাকে। তার মরদেহে শানিত লাল-হলুদ পতাকা জুড়ে দিয়ে ইস্টবেঙ্গলের কর্তারা। চিরতরে বিদায় জানালেন তাঁদের প্রিয় শঙ্কর পিল্লাইকে। শেষ হল এক দীর্ঘ স্মৃতিমেধুর অধ্যায়ের। ঘুমের দেশে ভালো থাকুন শঙ্করবাবা। আর পরজন্মে আপনি আবার ফিরে আসুন আপনার প্রিয় এই ইস্টবেঙ্গল তাঁবুতেই।

মহিলা ফুটবলের উত্থান একটি বিস্ময়কর উন্নয়ন : শুভাশিস চক্রবর্তী

শুভাশিস চক্রবর্তী। ডিটিডিসির'র কর্ণধার। এক সময় ইস্টবেঙ্গল গ্যালারিতে হাজির থাকতেন ম্যাচ দেখতে। কিন্তু বর্তমানে ব্যস্ততার দরুন মাঠে আসা হয় না তাঁর। তবু ইস্টবেঙ্গল অন্তপ্রাণ শুভাশিস এখনও খোঁজ রাখেন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের। এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানালেন পুরনো দিনের কথা।

পারিজাত মৈত্র, ইস্টবেঙ্গল সমাচার

●ছোট থেকে ইস্টবেঙ্গলের খেলা দেখে বড় হয়েছেন, সেই প্রসঙ্গে আপনার অনুভূতি কেমন?

শুভাশিস : যদিও আমি এখন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সহ-সভাপতি, তবুও আমি ছোটবেলা থেকেই তাদের অনুসরণ করে আসছি। আমার শৈশব থেকেই দলের খেলা দেখার অবিশ্বাস্য অভিজ্ঞতা হয়েছে। খেলোয়াড়দের দ্বারা প্রদর্শিত আবেগ, দক্ষতা এবং চেতনা সবসময় আমার জন্য অনুপ্রেরণার উৎস। আমি বিভিন্ন উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে ক্লাবের যাত্রা প্রত্যক্ষ করেছি, কিন্তু ভক্তদের অটল সমর্থন এবং ক্লাবের সমৃদ্ধ ইতিহাস এটিকে সত্যিই একটি স্মরণীয় অভিজ্ঞতা করে তুলেছে।

●বাংলার ফুটবলকে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে ভারতীয় ফুটবলের অতীত গৌরব ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে আপনার মূল্যবান মতামত কি?

শুভাশিস : বেঙ্গল ফুটবলের একটি গৌরবময় অতীত রয়েছে এবং সামগ্রিকভাবে ভারতীয় ফুটবলের জন্য সেই গৌরব পুনরুদ্ধার করার জন্য আমাদের কাজ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি অর্জনের জন্য, আমাদের যুব আকাডেমিগুলিতে বিনিয়োগ এবং তরুণ প্রতিভা লালন করে তৃণমূলের উন্নয়নে মনোনিবেশ করতে হবে। আন্তর্জাতিক ক্লাবের সাথে সহযোগিতা এবং আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার এক্সপোজার মূল্যবান শিক্ষার অভিজ্ঞতাও প্রদান করবে। উপরন্তু, পরিকাঠামো, কোচিং মান এবং স্কাউটিং সিস্টেমের উন্নতি বাংলা ফুটবলের উন্নতিতে সাহায্য করবে এবং ভারতীয় ফুটবলের সামগ্রিক বৃদ্ধিতে অবদান রাখবে।

●অনেকেই বলছেন, জনপ্রিয়তার দিক থেকে, মহিলা ফুটবল আগামীতে ছেলেদের ফুটবলের থেকেও এগিয়ে যাবে, এই সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

শুভাশিস : মহিলা ফুটবলের উত্থান একটি বিস্ময়কর উন্নয়ন এবং আমি বিশ্বাস করি এটি ভবিষ্যতে আরও জনপ্রিয়তা অর্জনের সম্ভাবনা রাখে। মহিলা খেলোয়াড়দের দ্বারা প্রদর্শিত সত্যিই অনুপ্রেরণাদায়ক। মহিলা ফুটবলকে সকল স্তরে উন্নত করে, সমান সুযোগ প্রদান করে এবং সামাজিক প্রতিবন্ধকতা ভেঙে আমরা এমন একটি পরিবেশ তৈরি করতে পারি যেখানে নারী ফুটবলের বিকাশ ঘটতে পারে। মহিলা দলের উন্নয়নে বিনিয়োগ করা, আরও ভালো সুযোগসুবিধা প্রদান করা এবং তাদের প্রাপ্য প্ল্যাটফর্ম দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ।

●শতাব্দী প্রাচীন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সাথে আপনি সংযুক্ত হয়েছেন, সমর্থকদের উদ্দেশ্যে কি বার্তা দেবেন?

শুভাশিস : ইস্টবেঙ্গল ফুটবল ক্লাবের সমস্ত সমর্থকদের কাছে, আমি সারা বছর ধরে আপনার অটল উৎসর্গ এবং সমর্থনের জন্য আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই। এটি আপনার আবেগ যা ক্লাবের চেতনাকে উজ্জীবিত করে। শতাব্দী প্রাচীন এই প্রতিষ্ঠানের সাথে আমাদের সম্পর্ক একটি গর্বের বিষয় এবং আমি আপনাকে আশ্বাস দিচ্ছি যে আমরা পূর্ব বাংলার সমৃদ্ধ উত্তরাধিকার ও মূল্যবোধকে সমুন্নত রাখতে সচেষ্ট থাকব। একসাথে, আসুন আমরা সাফল্যের নতুন অধ্যায় লিখতে থাকি এবং ক্লাবের জন্য একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ তৈরি করি।

●সাফল্যের নিরিখে আগামী দিনে ক্লাবকে আপনি কিভাবে দেখতে চান? এই বিষয়ে আপনার মূল্যবান পরামর্শ ক্লাবকে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সহায়তা করবে।

শুভাশিস : আমি ইস্টবেঙ্গল ফুটবল ক্লাবের জন্য একটি ভবিষ্যৎ কল্পনা করি যেটি সাফল্যের ভিত্তির ওপর নির্মিত। আমাদের লক্ষ্য দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় একটি প্রভাবশালী শক্তি হওয়া, বিশ্ব মঞ্চে আমাদের দক্ষতা এবং প্রতিভা প্রদর্শন করা। একটি শক্তিশালী যুব উন্নয়নে ব্যবস্থা থাকা অপরিহার্য যা তরুণ প্রতিভাকে লালন করে এবং তাদের সঠিক দিকনির্দেশনা ও সুযোগ প্রদান করে। আমাদের খেলোয়াড়রা যাতে তাদের পূর্ণ সম্ভাবনায় পৌঁছাতে পারে তা নিশ্চিত করতে আমরা অত্যাধুনিক পরিকাঠামো, আধুনিক সুবিধা এবং উন্নত কোচিং পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করব। আমাদের ভক্তদের ক্রমাগত সমর্থনে, আমরা সাফল্যের একটি নতুন অধ্যায় লিখতে পারি এবং ক্লাবটিকে আরও উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারি।

East Bengal

A name
that is dedicated
to a lost
motherland.

And people
who are really winners
- continuing to swear
by a game that is
in their blood.

Shyam Sundar Co.
Jewellers

Cheering
for East Bengal Club
Since 1960

SERUM™

One of the largest Path. Lab in India

বিশ্ব সেরা গোলরক্ষক মার্টিনেজকে বরণ ইস্টবেঙ্গলের

আসিয়ান কাপ জয়ের ২০ বছর

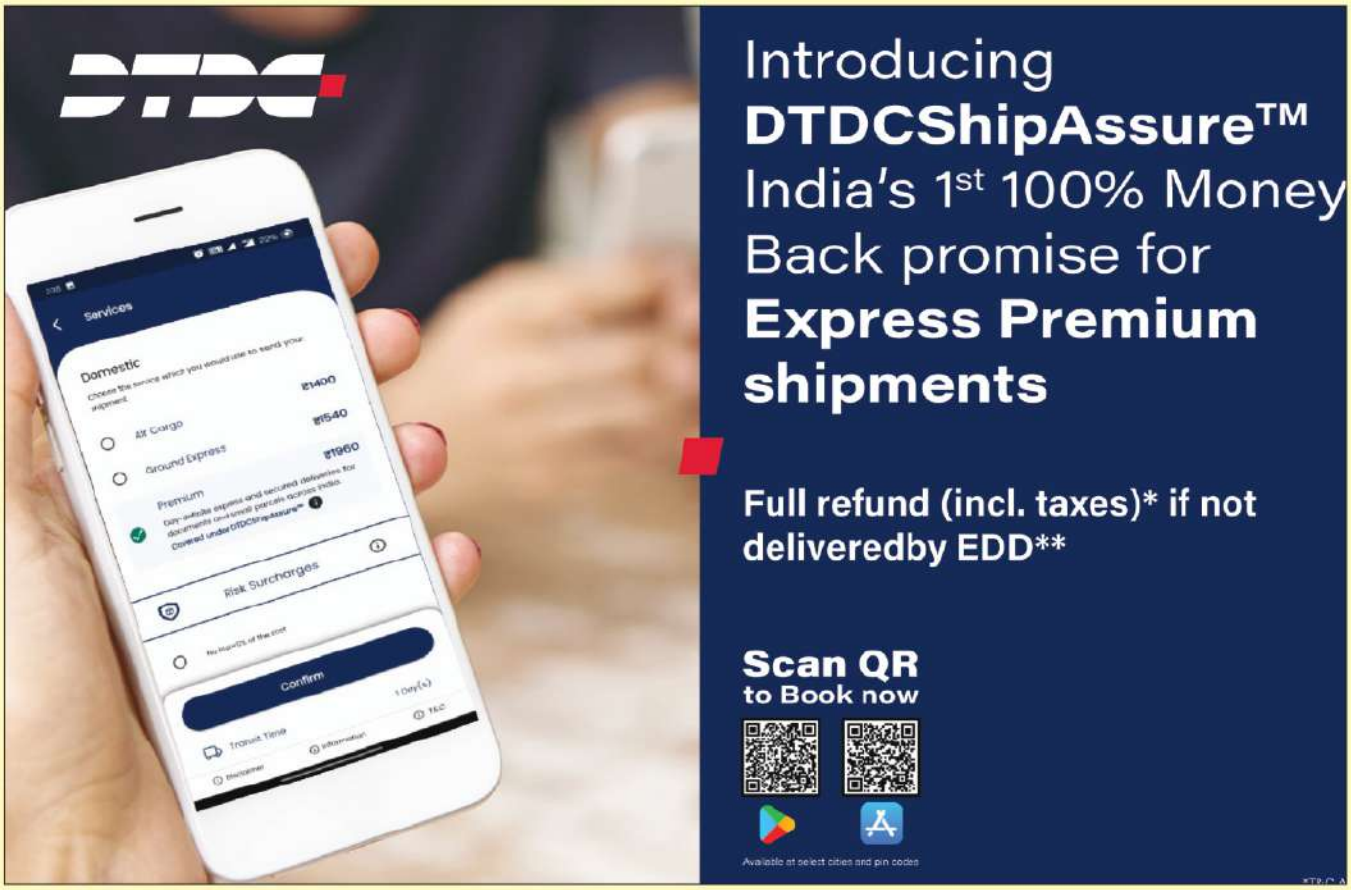

সম্পাদক : ডাঃ শান্তিরঞ্জন দাশগুপ্ত সম্পাদকমণ্ডলী : রাজীব গুহ, পারিজাত মৈত্র ও অরূপ পাল

ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের পক্ষে **মানিক দাসগুপ্ত** কর্তৃক প্রকাশিত এবং **কম্পেড** ওয়ার্কস দ্বারা মুদ্রিত।

ইস্টবেঙ্গল সমাচার নিয়মিত পাওয়া যাচ্ছে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব তাঁবুতে

ফোন : ০৩৩-২২৪৮৪৬৪২। e-mail:www.eastbengalclub.com